বাংলার ইতিহাসকথা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী : কলিকাতা

Recommended as a Text Book for Class VI of all schools of West Bengal and Tripura States by the Board of Secondary Education, West Bengal.
Vide Notification No. TB/74/VI/H/24 and
also Board's letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75.

বাংলার ইতিহাসকথা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম. এ., এল্.-এল্. বি., পি.-এইচ্. ডি.

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা - ৭০০০১২

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এই বইখানি রচিত হইল। যে বয়সে ছাত্র-ছাত্রীরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তাহাদের পক্ষে এই পাঠ্যসূচী কতদূর উপযোগী, ইহার বিচারের ভার যে-সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এ-বিষয় পড়াইবেন তাঁহাদের উপর রহিল। আমি এ-বিষয়ে মন্তব্য করা হইতে বিরত রহিলাম।

বিষয়বস্তুর আলোচনা যথা সম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিচার করিবেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশ-নির্দেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া এই বইয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করিব। ইতি—

কলিকাতা,
ডিসেম্বর, ১৯৭৫ } গ্রন্থকার

SYLLABUS

CLASS VI

HISTORY OF BENGAL

Geographical boundaries of Bengal

A. (i) Bengal in ancient times (References in the Vedas and the Epics). In Jaina, Buddhist literature, from the invasion of Alexander to the rise of the Guptas 326 B.C.—320 A.D. (Bare outlines)

(ii) Sasanka of Gauda (606-637 A.D.)—Career, Religion extent of his kingdom.

(iii) The Palas—Election of Gopala, Dharmapala, Devapala (750 A. D.—850 A.D.).
Civilisation & Culture in the Pala Period (Sanskrit literature, Buddhist Scholarship, Vernacular literature, Charyyapada & Vaisha-nava Poems ; Universities—Uddandapura and Vikramsila, Patronization of Nalanda Univer-sity ; art and architecture), Silabhadra, Atisa or Dipankara Srijnana, Pandit Dharmapala.

(iv) Decline of Pala Power ; Kaivarta Revolt, Rampala and the revival of the Pala—his conquest & career. Literature—Ramcharita of Sandhyakara Nandi, Chakrapani Dutta (Medical treatise).

(v) The Senas—Bijaya Sena, Ballala Sena, Lakshman Sena, Literary works, revival of Brahmanism in Bengal, Social reforms.

B. (i) Conquest of Nadiya, Capital of Lakshmana Sena by Ikhtiyar Uddin Muhammad-bin Bakhtiyar Khalji (1205 A.D.).

(ii) Rulers of Bengal : Ghiyas-ud-din Azam, Raja Ganes, Husain Shah, Nusrat Shah, Iliyas Shah. Literary works ; Religious Toleration—Social and Religious Reforms—Sri Chaitanya—Spread of Vaishnavism.

(iii) Bengal's resistance against the Mughals. Isankhan, Kedar Roy, Pratapaditya.

C. (i) Mughal Rule in Bengal : (outline only) Murshid Kuli Khan, Sujauddowla, Sharfraj, Alivardi, Sirajaddowla, Bargir depredations.

(ii) (a) Advent of Europeans, Principal Trade Settlements ; Conflict with the English—Plassey.

(b) Growth of English Power in Bengal—Clive, Mirzafar, Mir Kasem, Grant of Diwani, the Famine (1770), Permanent Settlement.

D. Renaissance in Bengal : Rammohan Roy, Debendranath Tagore, Iswar Chandra Vidyasagar, Rajnarayan Basu, Kesab Chandra Sen, Sri Ram Krishna Deva, Bankim Chandra (Bare outline).

E. Bengal Partition (1905) : Swadeshi Movement and its leaders—Surendranath Banerjee, Anandamohan Basu, Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Deshabandhu Chittaranjan Das.

F. Revolutionaries of Bengal—with special reference to Rashbehari Bose, Bagha Jatin, M. N. Roy, Khudiram, Benoy-Badal-Dinesh, Surya Sen & Chittagong Armoury Raid ; Matangini Hazra, Netaji and I.N.A.

G. Regeneration of Bengal in the 20th Century :

(a) Swami Vivekananda, (b) Sister Nivedita.

(c) Rabindranath Tagore, Asutosh Mukherjee, Jagadish Chandra Bose, Prafulla Chandra Ray, Aswini Kumar Dutta, Subhas Chandra Bose, Kazi Nazrul Islam, A. K. Fazlul Haque, Bidhan Chandra Ray.

H. Second Partition of Bengal (1947)—Boundaries of undivided Bengal and of partitioned Bengals (East Pakistan and West Bengal) with relevant historical background.

I. Rise of Bangladesh (1970-71)—(i) Sheikh Mujibar Rahman—Career—Awami League. (ii) India's contribution towards the Freedom Struggle of Bangladesh.

A text book of 120 pages (of which the text should comprise 110 pages and illustrations including Maps, Time lines and Charts—10 pages) should be taught. The book should be of 1/16 Double Demy Size and printed in Pica type.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

পরিচ্ছেদ—১

পরিচ্ছেদ—২

পৃষ্ঠাঙ্ক

দেশ পরিচিতি

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'—এই সোনার বাংলা কেবল শেখ মুজিবর রহ্‌মানের নূতন 'বাংলাদেশ' নহে। ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়িবার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার দেশকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছিল পূর্ব-পাকিস্তান। এইভাবে সোনার বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ, এবং শেখ মুজিবর রহ্‌মান কর্তৃক স্বাধীন পূর্ববঙ্গের 'বাংলাদেশ' নামকরণ প্রভৃতির ইতিহাস এই বইয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই বইয়ে অবিভক্ত বাংলাদেশকে 'বাংলা', 'বাংলাদেশ' উভয় নামেই বর্ণনা করা হইয়াছে। মুজিবর রহ্‌মানের 'বাংলাদেশের' সহিত ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্তি ঘটিবে না, আশা করি।

গ্রন্থকার

বাংলার ইতিহাসকথা

পরিচ্ছেদ—১

(ক) প্রাচীন কালে বাংলা (Bengal in Ancient Time) : অতি প্রাচীন কালের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেই যুগের বাংলার রাজ্যসীমা সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নহে। রাজার শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে বাংলার ভৌগোলিক সীমারও পরিবর্তন ঘটিত। সেজন্য প্রাচীন কালের বাংলার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা কঠিন। তবে প্রাচীন কালে বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, তখন উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভূটান, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তর-পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গ, পূর্বদিকে গারো, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যসীমার তারতম্য ঘটিয়াছিল।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ বাংলার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ঋক্ বেদে সেই হেতু বাংলার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐতরেয় আরণ্যকেই সর্বপ্রথম বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে এবং পরবর্তী কালে বাংলা সম্পর্কে সরাসরি কোন উল্লেখ না থাকিলেও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের বর্ণনা দিতে গিয়া অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর প্রভৃতি জাতিকে 'দস্যু' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। উত্তরবঙ্গ তখন পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বাঙালীর পূর্বপুরুষগণ আর্যদের নিকট 'দস্যু' নামে অভিহিত হইত। বৈদিক যুগের শেষ দিকে আর্যগণ ও আর্য সভ্যতা বাংলা তথা বাঙালীর মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে শুরু করিয়াছিল। বাংলাদেশে যে-সকল আর্য আসিতেন তাঁহাদিগকে 'পতিত' অর্থাৎ 'ভ্রষ্ট' আর্য বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

রামায়ণ-মহাভারতেও একাধিকবার বাংলার উল্লেখ আছে। এই দুই মহাকাব্যে পুণ্ড্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ, সুহ্ম অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সেই সময়ে উন্নত, সুসভ্য অধিবাসীদের পাশাপাশি অসভ্য ও অনুন্নত জাতির লোকও বসবাস করিত তাহা রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাকাব্য হইতে জানা যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাঙালী বীর সন্তান রাজপুত্র বিজয় সিংহ সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) জয় করিয়াছিলেন। 'বিজয় সিংহ' নামটি আর্য নামানুকরণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। সুতরাং আর্য সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বাংলার উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণকালে মহাবীরকে এ-দেশের লোকেরা প্রহার করিয়াছিল এবং 'চু, চ্ছু' বলিয়া তাঁহার পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। জৈন গ্রন্থে এই নিষ্ঠুর কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও বঙ্গ, সুহ্ম, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ আছে।

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭-২৬ খ্রীঃ পূঃ) সময় হইতে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়। গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের রচনায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর ভারতবর্ষে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল। বাংলাদেশের উত্তরাংশ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গ বংশের শাসনকালে পুণ্ড্রনগর খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে কুষাণ আমলে বাংলাদেশ কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা সে-সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। অবশ্য বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কুষাণ রাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বাংলার উপর কুষাণ প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় না।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গে সমতট রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গে পুষ্করণ রাজ্য স্বাধীন ছিল একথা জানা যায়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের আমলে এই দুই রাজ্যের উপর গুপ্ত সম্রাটের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের আমলে বাংলার উত্তরাংশ লইয়া পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

মূল গুপ্ত বংশের পতনের পর সেই বংশেরই এক শাখার শাসনাধীনে উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী) এবং পশ্চিমবঙ্গ (সুহ্ম বা রাঢ়) লইয়া গৌড় রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। গুপ্ত বংশের এই শাখা 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' (Later Guptas) নামে ইতিহাসে পরিচিত।

(খ) গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক, ৬০৬-৬৩৭ খ্রীঃ (Sasanka of Gauda, 606-637 A. D.) ঃ শশাঙ্ককে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাঙালী রাজা বলিয়া মনে করা হয়। তিনি কিভাবে এবং ঠিক কোন্ বৎসর সার্বভৌম গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সার্বভৌম বা সম্পুর্ণ স্বাধীন রাজা হইবার পূর্বে তিনি একজন 'মহাসামন্ত' অর্থাৎ রাজার অধীনে স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন। তিনি গুপ্ত রাজবংশেরই অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি নামক স্থানটিই কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। শশাঙ্ক কেবল গৌড়কে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজ্যের মর্যাদায় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বাহুবলে নিজ রাজ্যের সীমা দক্ষিণে গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি নামক পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিকে মগধ ও বারাণসী রাজ্য তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। এই দুইটি রাজ্যই শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পর শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহিত একত্রে মৌখরী বংশের রাজা গ্রহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

মালবরাজ দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নী। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল, ফলে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর রাজ্যভার দিয়া ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। দেবগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হইলেন। কিন্তু ইহার পরই দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি তিনি পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করিতে না পারেন তাহা হইলে আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিবেন। ইহার পর হর্ষবর্ধন সেনাবাহিনীসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সেনাপতি ভাণ্ডির উপর শশাঙ্ককে শাস্তিদানের ভার দিয়া হর্ষবর্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সন্ধানে চলিলেন। এদিকে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের শক্তি ও প্রতিপত্তিতে ভীত হইয়া হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন কোন সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। একমাত্র 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের হস্তে শশাঙ্কের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের কোন সম্মুখ সমর ঘটিয়াছিল কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে। বাণের হর্ষচরিত বা সমসাময়িক অপর কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের কোথাও

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের হস্তে শশাঙ্কের পরাজয়ের কোন উল্লেখ নাই। হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধন পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করিবেন—এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ আছে, অথচ শশাঙ্ককে তিনি পরাজিত করিয়াছেন এরূপ উল্লেখ না থাকায় শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, একথাই প্রমাণিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু পর্যন্ত গৌড়, দণ্ডভুক্তি, মগধ, উৎকল বা কঙ্গোদ, কোন অংশই তাঁহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব অর্থাৎ শিবের উপাসক। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তিটিকে নিকটবর্তী এক হিন্দু মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ গ্রন্থে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধদের উপর শশাঙ্কের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল অত্যাচারের কাহিনী যে অলীক তাহা হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র তখন বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শশাঙ্কের ন্যায় শক্তিশালী রাজা যদি বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে পারিত না। সেজন্য বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

হিউয়েন সাঙ

বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাসে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন। আর্যাবর্তে বাংলার সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা সর্বপ্রথম শশাঙ্কের মনেই স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার সমরকুশলতা ও দূরদর্শিতায় এই কল্পনা বহুলাংশে সফল হইয়াছিল।

পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের অধীনতা হইতে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যকে স্বাধীন করিয়া এক সার্বভৌম বাঙালী সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। ক্রমে সমগ্র বঙ্গ, দণ্ডভুক্তি (দাঁতন ?), উৎকল ও কঙ্গোদ (উত্তর ও দক্ষিণ উড়িষ্যা), মগধ, বারাণসী প্রভৃতি তিনি অধিকার করেন। কূটনীতিতেও শশাঙ্ক পারদর্শী ছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক ছিলেন একাধারে সমরকুশল সেনাপতি, সুদক্ষ যোদ্ধা এবং সফল কূটনীতিক। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম বাঙালী সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা।

(গ) পাল বংশ (The Palas): রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রীঃ) পর হইতে প্রায় একশত বৎসর বাংলার ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কাল ছিল। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অনৈক্য, বাহির হইতে ঘন ঘন আক্রমণ প্রভৃতির ফলে বাংলাদেশ দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল। দেশ তখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজ্যে বিভক্ত। এই সকল ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের ফলে বাংলাদেশে তখন 'মাৎস্যন্যায়' চলিতেছিল। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেরূপ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজা দুর্বল রাজার দেশকে গ্রাস করিয়া লইতে ব্যস্ত ছিলেন। অবিচার, আত্ম-কলহ, অরাজকতা প্রভৃতির ফলে সাধারণ লোকের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্কটে বাংলার জনসাধারণ তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের এক অতি সুন্দর পরিচয় দিলেন। তাঁহারা গোপাল নামে একজন স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ): আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালের সিংহাসন আরোহণ বাংলার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আনুগত্য লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গোপাল প্রথমেই দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। তিনি

বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ): পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির প্রকৃত স্থাপয়িতা। আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি মোট ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর ধর্মপাল আর্যাবর্ত জয় করিতে অগ্রসর হন। সেই সময়ে গুর্জর-প্রতিহার রাজা বৎসরাজও আর্যাবর্ত জয় করিতে অগ্রসর হইলে দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ধর্মপালের পরাজয় ঘটে। এমন সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুব আর্যাবর্ত জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া বৎসরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। বৎসরাজ ও ধ্রুবের সংঘর্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মপাল মগধ ও বারাণসী জয় করিয়া লইলেন। ইহার পর ধ্রুব ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে দুই জনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার রাজ্যসীমার কোন ক্ষতি হইল না। ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল আর্যাবর্তে নিজ অধিকার বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। ধর্মপালের রাজ্যসীমা উত্তরে দিল্লী ও জলন্ধর হইতে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কনৌজের সিংহাসন হইতে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া নিজ মনোনীত তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্মপাল সেখানে এক রাজসভার আহ্বান করেন। সেই রাজসভায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, কীর, গন্ধার প্রভৃতি দেশের রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ধর্মপাল যে সম্রাট বা

মহারাজাধিরাজের সম্মান ভোগ করিতেন সেকথা অনুমান করা যায়। কিন্তু পরে গুর্জর দেশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়া নিজ সার্বভৌমত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ধর্মপাল বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের দিকেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার আমলেই বিক্রমশীলা মহাবিহারটি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের দিকেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার আমলেই বিক্রমশীলা মহাবিহারটি নির্মিত হইয়াছিল।

ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতিও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি জমি দান করিয়াছিলেন। গর্গ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী।

দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ): দেবপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি গুর্জররাজ প্রথম ভোজকে এবং দ্রাবিড় রাজা অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি লবসেন বা লৌসেন আসাম ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে কম্বোজ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেবপালের সুখ্যাতি সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। সুমাত্রা হইতে যে-সকল বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী ভারতে তখন আসিতেন তাঁহাদের থাকিবার জন্য একটি মঠ নির্মাণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম সেজন্য দান করিয়াছিলেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ভারতের

বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

পাল বংশের অপরাপর রাজার ন্যায় দেবপালও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁহার চেষ্টায় উত্তর ভারতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। দেবপাল নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মগধের পুরাতন বৌদ্ধ মঠগুলিরও তিনি সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। দেবপাল ছিলেন বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার রাজসভায় বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিতেন।

পাল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি : শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, সব দিক দিয়াই পাল যুগ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। পাল যুগের পূর্বে এবং পাল যুগের প্রথম দিকে বাংলাদেশে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। এই সময়কার কবিতায় খুব বড় বড় শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই ধরনের বাক্যবিন্যাস 'গৌড়ীয় রীতি' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে এই গৌড়ীয় রীতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। পাল রাজগণের পদস্থ কর্মচারীদের অনেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন।

পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ধর্মযাজক শান্তিরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের উপর তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহা-জেতারি, জেতারি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানমিশ্র, কুমারচন্দ্র, কুমারবজ্র, নাগবোধি প্রমুখ বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া পাল যুগের শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সূচনা পাল যুগে হইয়াছিল। ইহার পূর্বে 'সৌরসেনী অপভ্রংশ' নামে এক প্রকার হিন্দী

ভাষা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষ দিক হইতে আদি বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। এই আদি বাংলা ভাষা হইতেই প্রাচীন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। নেপালে প্রাপ্ত চর্যাপদ হইল বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ। চর্যাপদগুলিতে সন্নিবিষ্ট বহু প্রবাদ আজিও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। চর্যাপদ-রচয়িতা কবিদের মধ্যে লুইপা, কাহ্নপা, জালন্ধরিপা বা হাড়িপার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদ ভিন্ন হিন্দু ধর্ম-সম্বন্ধীয় কবিতা, গীত প্রভৃতিও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীও পাল যুগে রচিত হয়। বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় পদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। রচনা ও ভাবের দিক দিয়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের অনুকরণে পরবর্তী দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর চরম উৎকর্ষ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পাল যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অপরাপর ধর্মের প্রতি তাঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

পাল যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দেবপাল নালন্দায় কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় একটি বিরাট

মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। ইন্দ্রদেব নামে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শী জনৈক ব্রাহ্মণকে দেবপাল নালন্দার আচার্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল সুমাত্রা হইতে প্রেরিত শিক্ষার্থীদের থাকিবার সুবিধার জন্য নালন্দায় পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এইখানে বালপুত্রদেব একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

পাল যুগে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে
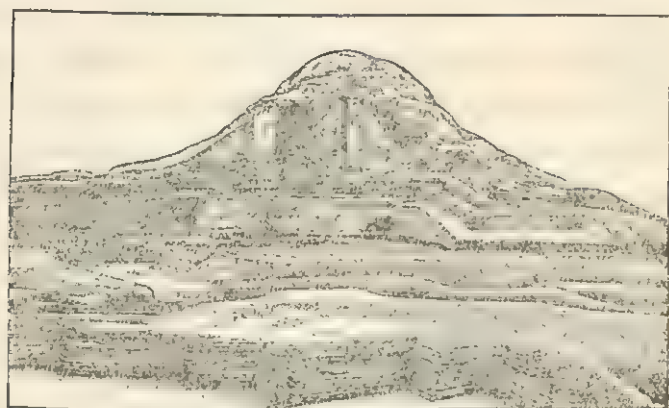
সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ

১০৭টি মন্দির এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপিত হইয়াছিল। মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক এই ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করিতেন। এই সকল মহাবিহার বিদ্যাশিক্ষার, বিশেষভাবে বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এই সকল মহাবিহারের নির্মাণকৌশলও সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পাল যুগের নির্মিত

কয়েকটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে কালীমূর্তির গঠন-কৌশল পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতির পরিচয় বহন করে। ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল ছিলেন পাল যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। চিত্রশিল্প ও ধাতুমূর্তি নির্মাণেও তাঁহারা অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন।

কালীমূর্তি (পাল যুগ)

পাল যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও শীলরক্ষিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মূল নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। ওদন্তপুরী মহাবিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার পর আচার্য শীলরক্ষিত তাঁহার নাম রাখেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ নামেও তিনি পরিচিত হন। আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্যপদ গ্রহণ করেন। এইখানে অধ্যাপনায় রত থাকিবার কালে তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করিবার জন্য যান। সেখানেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শীলভদ্র : শীলভদ্র ও ধর্মপাল পাল যুগের বহু পূর্বেকার দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত ছিলেন। শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান ছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ধর্মপালের নিকট মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার এত গভীর জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, দেশে-বিদেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের নিকট নালন্দায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মবিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শীলভদ্র ক্রমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'আর্য-বুদ্ধভূমি-ব্যাখ্যায়ান' তিব্বতী ভাষায় এখনও বিদ্যমান। শীলভদ্র ছিলেন তাঁহার সময়ের বৌদ্ধ শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক।

ধর্মপাল : ধর্মপাল ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সময়কার বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শীলভদ্র তাঁহার নিকটই বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের গভীর পাণ্ডিত্য হইতেই তাঁহার অধ্যাপক ধর্মপালের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

(ঘ) পালশক্তির পতনোন্মুখতা (**Decline of the Pala Power**) : দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পরাক্রম ও গৌরব ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। পরবর্তী পাল রাজগণ—যথা, বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন দুর্বল, অকর্মণ্য। ইহাদের রাজত্বকালে স্বভাবতই পাল সাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দশম শতাব্দীর শেষভাগে কম্বোজ বা কাম্বোজ নামে এক পার্বত্য জাতি পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কম্বোজ জাতি কোন্ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না।

পাল বংশের নবম রাজা প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) ছিলেন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি কাম্বোজ জাতিকে বিতাড়িত করিয়া পাল বংশের সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি কতকাংশে পুনরায় উদ্ধার করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ববঙ্গ হইতে মিথিলা ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রথম মহীপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহার আমলে নালন্দার একটি বিশাল মন্দির পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বকালের শেষদিকে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া তীরভুক্তি (তিরহুত বা মিথিলা) অঞ্চলটি দখল করিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণের তামিল রাজা রাজেন্দ্র চোলদেব উড়িষ্যার মধ্য দিয়া সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধে প্রথম মহীপালকে পরাজিত করেন (১০২৩ খ্রীঃ)। কিন্তু চোল আক্রমণে মহীপালের রাজ্যের কোন অংশ হাতছাড়া হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল (১০৩৮-৫৫ খ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৫৫-৭০ খ্রীঃ) আমলে পাল অধিকার ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বিশেষভাবে বাংলার পশ্চিম অংশের উপর তাঁহাদের অধিকার ক্রমেই হ্রাস পায়। কলচুরী রাজবংশের এবং উড়িষ্যার রাজবংশের আক্রমণ পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল এবং পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ পাল অধিকারচ্যুত হইয়া গিয়াছিল।

কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অপর দুই ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় মহীপালের বিপদ কাটিল না। অল্পকালের মধ্যেই দিব্য বা দিব্বোক নামে কৈবর্ত জাতির জনৈক নেতা এক ভীষণ বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন। এই বিদ্রোহে বাংলাদেশের উত্তরাংশের প্রজাগণ যোগদান করে। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহ

দমন করিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারান। দিব্য বা দিব্বোক উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য স্থাপন করেন। দিব্বোকের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম উত্তরবঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রামপাল (১০৭৫-১১২০ খ্রীঃ): দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিব্বোকের উত্তরাধিকারী ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রাষ্ট্রকূট রাজপরিবারের সহিত রামপালের আত্মীয়তা ছিল। সেই সূত্রে তিনি রাষ্ট্রকূটদের এবং বাঙালী সামন্তরাজগণের সাহায্য লইয়া ভীমকে পরাজিত করেন এবং উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। ভীম ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলকে হত্যা করা হয়। ভীমের সহিত যুদ্ধজয়ের পর রামপালের সর্বপ্রথম কাজ হইল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। দেশে তখন অরাজকতার সুযোগে জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। দেশবাসী তখন অত্যধিক করভারে জর্জরিত ছিল। রামপাল এই করভার হ্রাস করিলেন। কৃষির উন্নতি এবং জনসাধারণের সুখ ও শান্তির জন্য তিনি সকল প্রকার ব্যবস্থা করিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং কৈবর্ত শাসন-কালে যে অরাজকতা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ চলিতেছিল তাহার অবসান ঘটাইয়া রামপাল দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন। কৃষি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। রামপাল দেশের শাসনব্যবস্থাকে জন-সাধারণের স্বার্থে নিয়োজিত করিলেন। রামাবতী ছিল রামপালের রাজধানী। এই নগরের সৌন্দর্য ও জাঁকজমক সম্পর্কে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গে নিজ অধিকার সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া রামপাল পাল বংশের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে পাল অধিকার পুনঃস্থাপনের পর তিনি আসামের রাজাকে পরাজিত করিলেন। ইহা ভিন্ন উড়িষ্যার কলিঙ্গ পর্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য হইতে রামপালের চরিত্র, ক্ষমতা ও শাসনদক্ষতা সম্পর্কে

সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পতনোন্মুখ পাল সাম্রাজ্যের অতি সামান্য অংশের রাজা হিসাবে জীবন শুরু করিয়া রামপাল নিজ ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। এমন কি, তিনি আসাম ও উড়িষ্যার উপর নিজ অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গাহড়বাল, চালুক্য এবং গঙ্গবংশীয় রাজগণের শক্তি ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে তিনি পাল রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। বহিরাগত আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে রামপালের রাজত্বকালের শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে নাই।

রামপালের রাজত্বকালে পাল বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিলেও পরবর্তী পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বিজয় সেন বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

পুনরুজ্জীবিত পাল রাজত্বকালের সাহিত্য ও অপরাপর রচনা ঃ দ্বিতীয় মহীপালের অধীনে পাল রাজত্বের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল তাহা রামপালের রাজত্বকালে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে একই সঙ্গে রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী এবং পাল বংশীয় রাজা রামপালের রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে কলিকালের বাল্মীকি বলিয়া পরিচয় দিতেন। রামচরিতে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ, বিদ্রোহীদের হস্তে দ্বিতীয় মহীপালের পরাজয় ও প্রাণহানি, রামপালের রাজত্বকালের সুব্যবস্থা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামচরিতে কৈবর্ত বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়া রামপালের মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। রামচরিত হইতে এই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্যাদি জানিতে পারা যায়। কাব্য হিসাবে অবশ্য রামচরিত একটি সার্থক রচনা, একথা বলা চলে না।

একাদশ শতকে চক্রপাণি দত্ত নামে একজন বাঙালী চরক ও সুশ্রুতের উপর দুইখানি টীকা লিখেন। চরকের উপর তাঁহার রচিত

২

টীকার নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা এবং সুশ্রুতের উপর টীকার নাম ভানুমতী। চক্রপাণি দত্তের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রচনা হইল তাঁহার চিকিৎসা-সারসংগ্রহ। ঔষধ প্রস্তুতে বিভিন্ন ধাতু কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়ে ইহা একটি মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন শব্দচন্দ্রিকা, দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি দত্তের রচনা ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এক যুগান্তর আনিয়াছিল।

চক্রপাণি দত্ত ভিন্ন সুরেশ্বর, বঙ্গ সেন প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে বাঙালীর অবদানকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

(ঙ) সেন বংশ (The Senas) ঃ সামন্ত সেন ঃ হেমন্ত সেন ঃ সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল হইতে বাংলাদেশে বসবাস করিতে চলিয়া আসেন। প্রথমে তিনি পাল রাজগণের সামন্তরাজ হিসাবে রাঢ় অর্থাৎ বর্তমান বর্দ্ধমান জেলার কোনও এক স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেনও পাল রাজগণের সামন্তরাজ ছিলেন। কিন্তু হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের আমল হইতে সেনবংশ স্বাধীন রাজার মর্যাদা গ্রহণ করে।

বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) ঃ বিজয় সেন প্রথমে, পাল রাজগণের অধীনে সামন্তরাজ হিসাবেই রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপালের পরবর্তী পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে তিনি পাল শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বাধীন হইয়া পড়েন। কেবল পাল রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি গৌড়, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলের রাজগণকে এবং বহু স্থানীয় দলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এক বিরাট রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গ বিজয় সেনের সহিত মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয় সেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর রাজ্যটি দখল করিয়া সেখানে বিজয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাল বংশের রাজত্বকালের শেষ দিকে বাহির হইতে আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ অরাজকতার ফলে বাংলাদেশ যখন বিধ্বস্ত, সেই সময়ে বিজয় সেন বাংলাদেশে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য স্থাপন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বিজয় সেন পাল বংশের স্থাপয়িতা গোপালের ন্যায়ই কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। জাতীয় বিপদে বাঙালীদের মধ্যে নেতৃত্বের যে অভাব হয় নাই, তাহা গোপাল ও বিজয় সেনের ইতিহাস হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিজয় সেনের আমলে সাধারণ মানুষের মনে শান্তি ও সন্তোষের অভাব ছিল না, সেই কথা কবি উমাপতি ধরের রচনায় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ রচিত বিজয়-প্রশস্তিতেও বিজয় সেনের রাজত্বকালের সুব্যবস্থা, শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশংসা রহিয়াছে।

বল্লাল সেন (১১৫৮-৭৯ খ্রীঃ) ঃ বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ শক্তিবৃদ্ধি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্দি ও মিথিলা —অর্থাৎ বাংলা ও উত্তর বিহার লইয়া গঠিত ছিল। তিনি বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কুলীনদের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিতে হইত।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) ঃ বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'গৌড়েশ্বর' এবং 'অরি-রাজ-মণ্ডন-শঙ্কর' উপাধি ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববর্তী সেন রাজগণ ছিলেন শিবের উপাসক কিন্তু লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। লক্ষ্মণ সেন বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকগণকে রাজসভায় স্থান দিয়া রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একজন

লক্ষ্মণ সেন

সাহিত্যিক ছিলেন। পিতা বল্লাল সেন আরব্ধ 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থখানি লক্ষ্মণ সেন সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর প্রভৃতি তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের প্রধান বিচারপতি।

পরম বৈষ্ণব হইলেও লক্ষ্মণ সেন সেই যুগে দেশ জয় করা প্রভৃতি রাজার কর্তব্যকার্যে অবহেলা করেন নাই। তিনি মিথিলার উপর অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন এবং গয়া জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ ও পশ্চিম বিহার তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। গাহড়বালের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণ সেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিন তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনকে একজন প্রতাপশালী 'রায়' অর্থাৎ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নদীয়া ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ ও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিদেশী লেখকের বিবরণে লক্ষ্মণ সেনের এইরূপ উল্লেখ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ) কুতব-উদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জীর এক আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানে তাঁহার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল ধরিয়া সেনবংশীয় রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ: সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি সেন যুগের রাজগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। বল্লাল সেন আচার্যসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানি অবশ্য তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ছিলেন

একজন খুব জ্ঞানী পণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব জয়দেবকে তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। লক্ষ্মণ সেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পিতা বল্লাল সেনের ন্যায়ই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সভাকবি শরণ, উমাপতিধর, গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব, পবনদূতের রচয়িতা ধোয়ী, দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানী হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি প্রভৃতি বিদ্বান্ মনীষী লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়দেবের 'পদাবলী' এবং ধোয়ী রচিত 'পবনদূত' সেই সময়কার সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত।

সেন রাজগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্ম প্রচারের জন্য বল্লাল সেন মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে দূত পাঠাইয়াছিলেন। সেন রাজগণের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়া ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মূল কারণ ছিল এই যে, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে পূর্বেকার সহজ ও সরল ভাব পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনায় যে-সকল আচার, অনুষ্ঠান অনুসরণ করা হইত সেরূপ বুদ্ধদেবের পূজায়ও করা হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন বুদ্ধ ও মহাবীর বিষ্ণুরই অবতার বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। এই সকল কারণে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমে হিন্দু ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে লাগিল।

শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছিলেন। সমাজের সেই সকল বৈশিষ্ট্য পাল ও সেন রাজত্বকালেও বিদ্যমান ছিল। সেই যুগের বাঙালী জাতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। সমাজে ধর্মভীরু, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যেমন ছিল, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরও অভাব ছিল না। সেই যুগের বাঙালীর চরিত্রবল, সাধুতা, সাহস ও সংস্কৃতি প্রশংসনীয় ছিল। সেন বংশের

রাজা বল্লাল সেন বাঙালী হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সামাজিক আচার-আচরণ, বিবাহ প্রভৃতি নানা প্রকার অনুষ্ঠানে এই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে কতকগুলি বিশেষ রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে হইত। ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগত পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বৃদ্ধি করাই ছিল এই সকল রীতি-নীতির মূল উদ্দেশ্য। সেই সময়ে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা ছিল। তখনকার সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজপণ্ডিতগণ সমাজে এক অতিশয় মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহাদিগকে রাজগণ দানপত্র লিখিয়া জমি ভোগদখলের অধিকার দিতেন। পাল যুগের ন্যায়ই সেন রাজগণের রাজত্বকালে বাঙালী নারীদের প্রশংসা সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পর্দা প্রথার প্রচলন তখন ছিল না।

সেই যুগের বাঙালীর খাদ্য আজিকার বাঙালীদের মতই ছিল। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ঘৃত, দধি-দুগ্ধ এবং চাউল হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার দ্রব্য সেই যুগের প্রধান খাদ্য ছিল। সেই সময়ে বাংলাদেশে প্রচুর গুড় ও পেটা চিনি প্রস্তুত হইত। বাঙালীর পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর। স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরিতেন। সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন। বার মাসে তের পার্বণ, সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে নাচ, গান, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা এখনকার মতই সেই যুগে ছিল।

সেন যুগের স্থাপত্য শিল্পের ভগ্নাবশেষ বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে পাওয়া যায়। সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন শূলপাণি।

সেন যুগের বাঙালী ও বাংলাদেশ রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক) ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী কর্তৃক নদীয়া জয় (**Conquest of Nadia by Ikhtiyar-ud-din Muhammad bin Bakhtiyar Khalji**) : হিরাট ও গজনী রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘুর নামে একটি রাজ্য ছিল। ক্রমে গজনী রাজ্য ঘুর রাজ্যের অধিকারে চলিয়া যায়। ঘুর বংশের মোহম্মদ ঘুরী ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে চৌহান (রাজপুত) বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ ও অপরাপর রাজপুত রাজা মোহম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পর বৎসর (১১৯২ খ্রীঃ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজগণ পরাজিত হইলে মোহম্মদ ঘুরী ভারতে তাঁহার বিজিত রাজ্যগুলির ভার তাঁহার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কুতব-উদ্দিনের উপর ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। মোহম্মদ ঘুরীই ছিলেন ভারতে মুসলমান অধিকারের ভিত্তি-স্থাপয়িতা।

মোহম্মদ ঘুরী

কুতব-উদ্দিন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহকর্মী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জীকে বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী অর্থাৎ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর পুত্র ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ প্রথমে বিহার জয় করিলেন। লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিলে মন্ত্রী, জ্যোতিষী প্রভৃতি অনেকেই লক্ষ্মণ সেনকে তাঁহার রাজধানী নদীয়া

কুতব-উদ্দিন

ত্যাগ করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন এই সকল কাপুরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তখন লক্ষ্মণ সেনের বৃদ্ধ দশা। এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তিনি যখন আহারে বসিয়াছেন সেই সময় ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ ১৮ জন অশ্বারোহীসহ রাজধানীর তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বাহিনীর অন্য সকলে তখনও সামান্য পশ্চাতে ছিল। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ ও তাঁহার সহচরদিগকে রাজধানীর দ্বাররক্ষী অশ্ব-ব্যবসায়ী মনে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ শুরু করিলে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদের মূল সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন (১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ)। ইহার পর সেনবংশ ঢাকার নিকট তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া আরও দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন ইহা অতিরঞ্জিত কাহিনী ভিন্ন অপর কিছু নহে।

(খ) বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ঃ ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জী বাংলাদেশের একাংশ জয় করিয়া গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীকে রাজধানী করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দূরত্বই ছিল ইহার মূল কারণ। দিল্লীর সুলতান ইল্‌তুৎমিস, বলবন প্রভৃতি যদিও সাময়িকভাবে বাংলাদেশকে দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তথাপি ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখ্‌রুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণার পর হইতে দুই শত বৎসর বাংলার সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহ্‌ (১৩৪৫-৫৭ খ্রীঃ) ঃ ফখ্‌রুদ্দিন মুবারক শাহের বংশধর আলা-উদ্দিন আলী শাহ্‌কে হত্যা করিয়া হাজী ইলিয়াস 'শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌' নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে

আরোহণ করেন। তিনি বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেই সময় হইতে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ গৌরব ও কৃতিত্বের সহিত বাংলাদেশ শাসন করিতে সমর্থ হন। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিও সেই সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল।

সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৭-৯০ খ্রীঃ): ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে এবং দিল্লী সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল এবং সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার আদেশে পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার একাংশ এখনও বিদ্যমান। ইহার বাহিরে ও ভিতরে অতি সুন্দর কারুকার্য আছে।

গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ): সুলতান সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্য বিচার, আইনের চক্ষে ছোট-বড় সকলকেই সমান বলিয়া মনে করা প্রভৃতি সেই সময়ে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

আদিনা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

সুলতান গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পারস্যের কবি হাফিজের সহিত তিনি পত্র বিনিময় করিতেন। কবি হাফিজ তাঁহাকে একটি গজল রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আজম শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দূত বিনিময় হইয়াছিল। চৈনিক দূতদের সঙ্গে মা-হুয়ান দোভাষী হিসাবে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি

বিবরণ লিখিয়াছেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের জনসাধারণের পোশাক-পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল, বাংলাদেশে সেই সময়ে কি কি সামগ্রী প্রস্তুত হইত, বাঙালীরা কি ধরনের আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করিত তাহা মা-হুয়ানের বিবরণে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সেই সময়ে সমুদ্রগামী পোত নির্মাণ করা হইত।

গিয়াস-উদ্দিনের রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। তবে তিনি একবার কাম্‌তা রাজ্য ও কামরূপ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

রাজা গণেশ ঃ গিয়াস-উদ্দিনের পর তাঁহার পুত্র সৈইফ-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্ বাংলার সুলতান হন। তিনি ছিলেন যেমন দুর্বল তেমনি অকর্মণ্য। সেই সময়ে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার গণেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গণেশ অসামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের পরবর্তী তিনজন সুলতান—সৈইফ-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্, শাহাব-উদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ্ ও আলা-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্—ছিলেন যেমন অপদার্থ তেমনি দুর্বল। ফলে শক্তিশালী জমিদার গণেশের পক্ষে বাংলার সিংহাসন অধিকার করা মোটেই কঠিন ছিল না। তিনি আলা-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাংলার রাজা হইয়া বসিলেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য সেই সময়ে রাজা গণেশ সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু শাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। সিংহাসনে বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সহিত তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। রাজা গণেশ তখন অনেক মুসলমান দরবেশকে বধ করেন। দরবেশ নেতা নূর কুত্‌ব আলম গণেশকে দমন করিবার জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে অনুরোধ করেন। ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলাদেশে উপস্থিত হইলে রাজা গণেশ নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। রাজা গণেশ পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার

পুত্র যদুকে ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। যদু জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করেন। তিনি ক্রমে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। সেই সময়ে রাজা গণেশ, পুত্র যদুকে অর্থাৎ জালাল-উদ্দিনকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া দিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু এক বৎসর পরই রাজা গণেশের মৃত্যু হইলে জালাল-উদ্দিন পুনরায় সিংহাসন দখল করেন। জালাল-উদ্দিন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একলাখী মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।
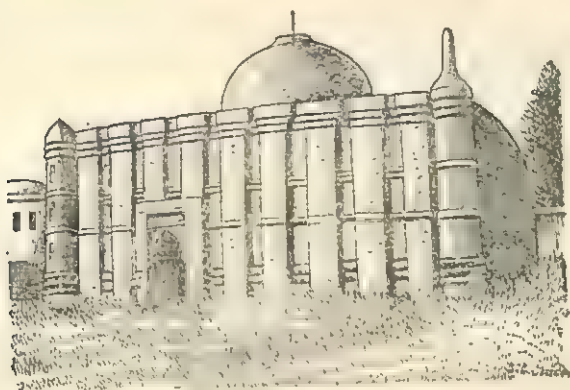
একলাখী মসজিদ

যদু বা জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্-উদ্দিন আহম্মদ শাহ্ সুলতান হন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই কর্মচারিগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহী বংশের জনৈক বংশধর নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌কে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসির-উদ্দিন মামুদ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রুকন্-উদ্দিন বারবক শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আবিসিনিয়া হইতে বহু ক্রীতদাস আমদানি করিয়াছিলেন। ইহারা হাব্‌সী ক্রীতদাস নামে পরিচিত ছিল। বারবক শাহের উত্তরাধিকারীদের

দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হাব্‌সী ক্রীতদাসদের নেতা সিদি বদর বাংলার সিংহাসন দখল করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার অযোগ্য শাসনে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখা দিলে বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্থানীয় জমিদার আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া হাব্‌সী শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

হুসেন শাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ): আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্ সাধারণ্যে হুসেন শাহ্ নামেই পরিচিত। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রথমেই হাব্‌সী ক্রীতদাস-দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিহারের একাংশ বাংলাদেশের অধিকারে আসে। হুসেন শাহ্ আসাম ও উড়িষ্যা জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই রাজ্যের কতক কতক স্থান তিনি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্ যেমন ছিলেন সুদক্ষ শাসক তেমনি বিদ্বান্ ও বিদ্যার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত অনুরক্ত। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্মের দিক দিয়া হুসেন শাহ্ অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি ধর্মের জন্য প্রজায় প্রজায় কোন প্রকার প্রভেদ করিতেন না। তাঁহার উজীর পুরন্দর খাঁ, দবীরখাস রূপ ও সনাতন গোস্বামী, চিকিৎসক মুকুন্দদাস, টাঁকশালের প্রধান কর্মচারী অনুপ—সকলেই ছিলেন হিন্দু। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে গুম্‌টি দরওয়াজা নামে একটি সুন্দর ফটক এবং ছোট সোনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি কারুকার্য ও স্থাপত্য কলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। হুসেন শাহ্ তাঁহার রাজ্যের প্রতি জেলায় হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ছোট, বড়, সকলেই চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা হিন্দু ও মুসলমান কর্তৃক সত্যপীরের পূজায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

নুসরৎ শাহ্ (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) : হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বাংলাদেশের সীমা তিরহুত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। পিতা হুসেন শাহের ন্যায়ই তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সামরিক দক্ষতা ও শাসনব্যবস্থা সর্ববিষয়েই তিনি অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বাবরের (মোগল) বাহিনী যাহাতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে না পারে সেইজন্য আফগান অভিজাতবর্গের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে মোগল সেনাকে বিহারে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য এক সংঘ স্থাপন করেন। গোগ্রার যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও অবশ্য শেষ পর্যন্ত নুসরৎ শাহ্ বাবরের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধি দ্বারা ঠিক কোন্ কোন্ স্থান তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছিল সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। নুসরৎ শাহ্ ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার আমলে গৌড়ে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
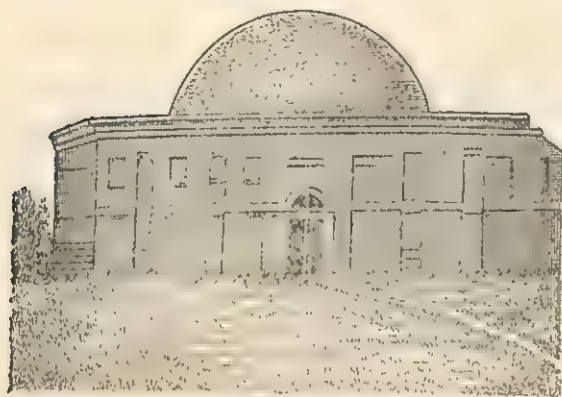
বড় সোনা মসজিদ

কদম রসুল

নুসরৎ শাহের পরবর্তী সুলতানগণ যেমন ছিলেন দুর্বলচেতা

তেমনি অকর্মণ্য। দুর্বলচেতা গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩-৩৮ খ্রীঃ) যখন বাংলার সুলতান তখন শের শাহ্ বাংলাদেশ জয় করিয়া দিল্লী সুলতানির অধীনে আনেন।

(গ) সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ : বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে অর্থাৎ ইলিয়াস শাহী বংশ ও হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ফলে বাঙালী জাতির সৃজনী প্রতিভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দুই বংশের সুলতানগণই বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভিন্ন এই সময়ে ফারসী ও হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ কাব্য-অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেও কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সহিত পত্র বিনিময় করিতেন। হাফিজ তাঁহাকে একটি গজ্‌ল রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে বিদ্যাপতির সহিত গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহের যোগাযোগ ছিল। বিদ্যাপতি তাঁহার রচনায় গিয়াস-উদ্দিন ও নুসরৎ শাহের সাহিত্যানুরাগের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন।

রাজা গণেশও সাহিত্য ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহার ধর্মান্তরিত পুত্র সুলতান জালাল-উদ্দিনের আমলেও বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত ছিল। সেই সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে জালাল-উদ্দিন সংবর্ধনা জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'রায়মুকুট' ও 'পণ্ডিত সার্বভৌম' উপাধি দিয়াছিলেন। পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র পদচন্দ্রিকা, স্মৃতি-রত্নহার প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। জালাল-উদ্দিনের সেনাপতি রায় রাজ্যধরের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহস্পতি মিশ্র রঘুবংশ টীকা, শিশুপালবধ টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, মেঘদূতের উপরও তিনি টীকা লিখিয়াছিলেন।

বারবক শাহ্ নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত। তিনি অন্যান্য পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের

পণ্ডিতগণকেই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহার সময়ে বিশারদ নামে জনৈক পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহারও কাহারও মতে বারবক শাহ্ই বৃহস্পতি মিশ্রকে পণ্ডিত সার্বভৌম ও রায়মুকুট উপাধি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃহস্পতি মিশ্র জালাল-উদ্দিন এবং বারবক শাহ্ উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের প্রণেতা কবি মালাধর বসু বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। বারবক শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়াছিলেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁহার রামায়ণের বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাংলার বাল্মীকি কৃত্তিবাস ঐ সময়ে সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ কৃত্তিবাসকে বাঙালীদের কাছে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহ্ ও তাঁহার বংশধরদের আমলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ও ফারসী সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকে উপলক্ষ করিয়া রাধা ও কৃষ্ণ সম্পর্কে কবিতা ও গান বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী প্রতিভার এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া উহা অব্যাহত ছিল। হুসেন শাহের আমলের লেখকদের মধ্যে বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ছিলেন অপূর্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী। ইনি শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া যান। বৈষ্ণব হইবার পূর্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন রূপ গোস্বামীর ভাই। ইনিও বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

প্রতি অনুরাগ এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, হুসেন শাহের রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর দ্বারা মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সৈয়দ মীর অলাওয়ী ফারসী ভাষায় ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইয়াজদান বখ্‌শ ছিলেন অপর একজন মুসলমান পণ্ডিত।

হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্‌ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম বাংলা মহাভারত। তাঁহারই কর্মচারী ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ছুটি খাঁ ছিলেন পরাগল খাঁর পুত্র।

নুসরৎ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আলা-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই তিনি কবি শ্রীধরকে দিয়া বিদ্যাসুন্দরের ভগবৎ প্রেমের কবিতার অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহী এবং হুসেন শাহী রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে। দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ্ বাংলাদেশ আক্রমণ করিলে হিন্দু রাজা ও হিন্দু পাইকগণ ইলিয়াস শাহ্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুলতান গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ তথা ইলিয়াস শাহী বংশের রাজগণ উচ্চ রাজকর্মচারী পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করিতেন। গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ অবশ্য পরে রাজকর্মচারী পদে হিন্দুদের নিয়োগ করা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা গণেশের আমলে মুসলমান দরবেশদের বিরোধিতা ঐ একই ধরনের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান প্রীতি যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বহু হিন্দু সাহিত্যিক ও রাজকর্মচারীর

দানে সেই যুগ পুষ্ট হইয়াছিল তথাপি হিন্দুদের ধর্ম প্রচারে—যেমন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কতক ব্যাঘাত তখন ঘটিয়াছিল। অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, হিন্দুদের কতক অসুবিধা মানিয়া চলাই ছিল তখনকার রীতি। ধর্মের ক্ষেত্রে এই ধরনের সঙ্কীর্ণতার উদাহরণ বাদ দিলে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সত্যপীরের পূজা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্য: হিন্দু সমাজের মধ্যে সেই যুগে যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়াছিল এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের দিক দিয়া যে কঠোর বিভেদ দেখা দিয়াছিল তাহা ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকটা দূর হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্মমতে সদাচারী ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণকারী চণ্ডালও যে গুণহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই কথাই বলা হইয়াছিল। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাইবার চেষ্টা ধর্মের বাহ্যিক আচার, অনুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এই ধারণা হিন্দু, মুসলমান, ছোট, বড় সকলের মধ্যেই এক নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছিল। ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। মুসলমান ধর্মের গণতান্ত্রিক উদারতাও সেই সময়কার সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক নূতন ভাবধারা আনিয়া দিয়াছিল। মুসলমান পীরদের অনেকে ভক্তি ও ভালবাসা, ভগবান আরাধনার সহজ পথ এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে-কোন শ্রেণী বা জাতির লোককে, মুসলমানদিগকেও তাঁহার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের

শ্রীচৈতন্য

অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে নিবিড় প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সূচনা বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলেই হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব হইতে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের পদাবলী ইহার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মকে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাহিরে এক শক্তিশালী ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ফলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে হিন্দু সমাজের কঠোর শাসনে জাতিভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট, পতিত নর-নারী বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া বৌদ্ধসংঘে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হইলে এই সকল নর-নারী নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার না থাকায় এই প্রকার নর-নারী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

(ঘ) বাংলাদেশ কর্তৃক মোগল আক্রমণে বাধাদান : দিল্লীর আফগান বাদশাহ্ শের শাহ্ বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই বাংলাদেশ কর্‌রানী বংশ নামে এক আফগান বংশের অধীনে স্বাধীন হইয়া পড়ে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে অবশ্য বাংলাদেশে মোগল অধিকার স্থাপিত হয় (১৫৭৬ খ্রীঃ)। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অংশের স্থানীয় জমিদারগণ তখনও স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সকল জমিদার ভূঞা (অর্থাৎ ভূস্বামী) নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে বারজন বারভূঞা নামে পরিচিত ছিলেন। কাহিনী-কিংবদন্তীতে বারভূঞার মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের প্রশংসা করা হইয়া থাকে। ইহাদের সকলেই দেশ ও দেশবাসীর রক্ষক হিসাবে আবিভূ ত

হইয়াছিলেন, বলা হইয়া থাকে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একথা অবশ্য স্বীকার করেন না। কর্‌রানী বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইঁহারা বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত দুর্গম স্থানে কতক স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলার বারজন ভূঞা কে কে সেই বিষয়েও কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। সাধারণত ঈশা খাঁ, মুশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, আনোয়ার গাজী প্রমুখ এই বারভূঞার প্রধান ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়।

ঈশা খাঁ: সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার শাসনকর্তা শাহ্‌বাজ খাঁ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঈশা খাঁকে দমন করিতে পারেন নাই। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে ঈশা খাঁ স্বাধীনভাবে জমিদারি করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন ধরিয়া মোগলদের বিরোধিতা করিতেছিলেন। মোগলদের শত্রু আফগান বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিতেও ঈশা খাঁ ভয় করেন নাই। শাহ্‌বাজ খাঁর পর রাজা মানসিংহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১৫৯৪ খ্রীঃ)। ঈশা খাঁকে দমন করিবার ভার এইবার তাঁহার উপর পড়িল। মানসিংহ তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাট নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এদিকে কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব কোচবিহারের সিংহাসন দখল করিবার জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ঈশা খাঁর সাহায্যও গ্রহণ করিলেন। এরূপ অবস্থায় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ রঘুদেব এবং ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সঙ্গে একটি নৌবাহিনীও প্রেরণ করেন। এই অভিযানের দায়িত্ব ছিল মানসিংহেরই পুত্র দুর্জনসিংহের উপর। মোগল বাহিনীর

মানসিংহ

সহিত যুদ্ধে রঘুদেব পরাজিত হইলেন, কিন্তু বিক্রমপুরের নিকটে ঈশা খাঁর হস্তে মোগল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। দুর্জনসিংহ প্রাণ হারাইলেন, তাঁহার সেনাবাহিনীর অনেকে বন্দী হইল। এই যুদ্ধে ঈশা খাঁ জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু মোগলদের বিরুদ্ধে এভাবে যুঝিয়া চলা ঠিক হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন (১৫৯৭ খ্রীঃ)। ইহার দুই বৎসর পর ঈশা খাঁ মারা যান।

কেদার রায়ঃ ঈশা খাঁ মোগল অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে পর মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কেদার রায় পূর্ববঙ্গের ঢাকার দক্ষিণ অঞ্চলে শেরপুর নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। তিনিও মোগল বশ্যতা অস্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে মালদহ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে মানসিংহ তাঁহার পুত্র মহাসিংহকে সেই দিকে পাঠাইলেন। ইহাতেই সমস্যা মিটিল না। কুৎলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান ময়মনসিংহের মোগল থানাদারকে সরাইয়া দিয়া সেই অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া প্রথমে ওসমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। এদিকে ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ কেদার রায়ের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ দ্রুত কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কেদার রায় ছিলেন দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি ব্রহ্মদেশের মগ জলদস্যু-দিগকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। মগ জলদস্যুগণ সেই সময়ে ঢাকা আক্রমণ করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়াছিল এবং বিপদে পড়িয়াছিল। মানসিংহ কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলে বিক্রমপুরের নিকট দুই পক্ষের মধ্যে এক দারুণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কেদার রায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। কিন্তু ঢাকায় মানসিংহের নিকট

তাঁহাকে উপস্থিত করিবার পূর্বে পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৬০৪ খ্রীঃ)। কেদার রায় ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। যুদ্ধে কঠিন আঘাত না পাইলে যুদ্ধের ফল কি হইত বলা যায় না।

প্রতাপাদিত্য: যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলাদেশের স্বাধীন জমিদারগণের অন্যতম প্রধান ছিলেন। বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণে প্রতাপাদিত্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। এই সকল বিবরণে তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি, সামরিক সংগঠন-ক্ষমতা, ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা ও মর্যাদা-বোধের উল্লেখ আছে। প্রতাপাদিত্যের যেমন বিশাল সমরবাহিনী ছিল, তেমনি একটি নৌবহরও ছিল। তাঁহার ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। এই সকল কারণে তাঁহাকে বাংলার স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার রাজ্য যশোর বা যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল ধূমঘাট নামক স্থানে। ইহা ছিল যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

রাজা প্রতাপাদিত্য

মোগল বাহিনীর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষার জন্য প্রতাপাদিত্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মোগলদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি বিনা শর্তেই মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে রাণা প্রতাপের সহিত অনেকে তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্পর্কে এরূপ উচ্চ ধারণা ইতিহাসসম্মত নহে। এরূপ তুলনা যেমন অযৌক্তিক তেমনি হাস্যকর বলিয়া স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন।

বাংলার জমিদারগণ মোগলদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ রাজ্য বা জমিদারি রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য। স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতা রক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহাদের চেষ্টাকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অসাধারণ কিছু বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু মোগলদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া মোগল বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহাদের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হয়ত অনেক সহজ হইত। কিন্তু তাঁহারা সেইভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহারা যে স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন একথা প্রমাণিত হয়। কেদার রায় আহত না হওয়া পর্যন্ত মরণ-পণ যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, কূটনীতি প্রভৃতিরও পরিচয় তাঁহার কার্য-কলাপের মধ্যে পাওয়া যায়।

কাহিনী-কিংবদন্তীর প্রশংসার আতিশয্য বাদ দিলেও মোগল সেনাদের মত দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য এই সকল জমিদারের চেষ্টা প্রশংসার বিষয় এবং বাঙালীর গৌরবের বিষয় একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অবশ্য বারভূঞাদের সকলেই সমান বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, একথা বলা চলে না। অনেকেই বিনা যুদ্ধে মোগল বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

পরিচ্ছেদ—৩

(ক) মোগল শাসনাধীনে বাংলা (Mughal Rule in Bengal) :

বাংলাদেশ দিল্লীর শাসন সহজে মানিয়া লয় নাই। বাংলাদেশে মোগল অধিকার স্থাপিত হইবার পরও বাংলার বিভিন্নাংশে স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ এবং আফগান দলপতিগণ নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। বাংলাদেশ মোগল শাসনের বিরুদ্ধে

বহুবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। এজন্য দিল্লীর মোগল বাদশাহ্‌গণ সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তাদের মধ্য হইতে বাংলার সুবাদার বা নবাব নিয়োগ করিতেন। রাজা মানসিংহ, ইস্‌লাম খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার পর হইতে বাংলার শাসনকর্তা অর্থাৎ নবাবের পদ বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে। নবাবগণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে শুরু করেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ) ঃ ঔরংজেব প্রথমে মুর্শিদকুলি খাঁকে রাজস্ব বিভাগের সামান্য কর্মচারী পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ হাদি। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া ঔরংজেব তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি দেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তাঁহাকে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁহার সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সম্রাট ঔরংজেব প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের পৌত্র বাংলার সুবাদার যুবরাজ আজিমের সহিত মুর্শিদকুলির বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। এজন্য সম্রাট ঔরংজেবের অনুমতি লইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে দেওয়ানি নূতন শহরে স্থানান্তরিত করিলেন। এই শহরের নাম মুর্শিদকুলির নামের অনুকরণে রাখা হইল মুর্শিদাবাদ।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যু হইলে সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ নিজ পুত্র আজিমকে আজিম-উস্‌-শান উপাধি দিয়া বাংলার সহিত বিহারেরও সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদকুলিকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান হিসাবে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দুই বৎসর পর মুর্শিদকুলিকে আবার বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনা হইল। ইহার অল্পকাল পরে তাঁহাকে বাংলার সহকারী সুবাদার, উড়িষ্যার সুবাদার এবং শেষ পর্যন্ত ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হইল। সেই সময় হইতে তিনি একপ্রকার স্বাধীন নবাব হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট

ফারুক্‌শিয়ার ইংরেজ বণিকদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিলেন, মুর্শিদকুলি তাহা অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধা করেন নাই।

বাংলাদেশের রাজস্বব্যবস্থার ইতিহাসে মুর্শিদকুলির নাম অমর হইয়া আছে। বাংলাদেশে আসিয়া মুর্শিদকুলি লক্ষ্য করিলেন যে, রাজকর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে বিশাল পরিমাণ জমি জায়গির হিসাবে অধিকার করিয়া আছেন। ফলে জমি হইতে কোন রাজস্ব আদায় হইত না। সরকারের আয়ের একমাত্র পথ ছিল জিনিসপত্রের উপর নির্ধারিত শুল্ক। মুর্শিদকুলি সরকারী কর্মচারীদের অধীনে জমি সরকারের নিজ দখলে লইয়া আসিলেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্বের বিনিময়ে সেই জমি ইজারা দিলেন। এই সকল ইজারাদারই ক্রমে জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। ইংরেজ আমলে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই ইজারা দিবার ব্যবস্থাই স্থায়ী করিয়া দিয়াছিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)।

মুর্শিদকুলি খাঁ মিতব্যয়িতা, রাজস্ব আদায়ের ব্যয় হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় সৈন্য সংখ্যা হ্রাস, সর্বোপরি তাঁহার শাসনদক্ষতার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় পারদর্শী, কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান বাঙালী হিন্দুদিগকে তাঁহার সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সুজা-উদ্‌-দৌলা বা সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ): পরবর্তী নবাব ছিলেন সুজা-উদ্‌-দৌলা। ইনি ছিলেন মুর্শিদকুলির জামাতা। মুর্শিদকুলির কোন পুত্র-সন্তান ছিল না এজন্য জামাতা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের শেষ দিকে বিহার সুবা বাংলার নবাবের অধিকারে আসে। সুজা-উদ্‌ দৌলা প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্য সর্বদা মনোযোগী ছিলেন। নিরপেক্ষ বিচার, জমিদারদের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার, অধীনস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রতি উদারতা প্রভৃতি ছিল তাঁহার শাসনের বৈশিষ্ট্য। সুজা-উদ্‌-দৌলা স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুর্শিদাবাদে দেওয়ান খানা, খিলাৎখানা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সুন্দর অট্টালিকা

তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলির আমলে একটি মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হইয়াছিল, সেই মসজিদ সুজা-উদ্-দৌলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং উহাতে একটি জলাশয় ও বাগান তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজা-উদ্-দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন।

সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ)ঃ সরফরাজ খাঁ পিতার শেষ ইচ্ছা অনুসারে পিতার আমলের কর্মচারীদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি ক্ষমতাহীন। বাংলাদেশের উপর শাসনক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে যে দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল সেই সকল গুণের কোন কিছুই সরফরাজ খাঁর চরিত্রে ছিল না। ফলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। এই দুর্বলতার, বিশেষভাবে নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হইতে সচেষ্ট হইলেন। ঘেরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত (১৭৪০ খ্রীঃ) করিয়া তিনি বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ)ঃ আলিবর্দী খাঁর মূল নাম ছিল মির্জা মহম্মদ। তিনি সুজা-উদ্-দৌলার অধীনে সামান্য বেতনে চাকরি শুরু করিয়া নিজ দক্ষতা ও চতুরতার ফলে সুজা-উদ্-দৌলার অত্যধিক বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। বিহার সুবা বাংলা সুবার সহিত সংযুক্ত হইলে সুজা-উদ্-দৌলা আলিবর্দীকে বিহারের সরকারী সুবাদারপদে নিযুক্ত করেন। এইভাবে পদোন্নতির ফলে আলিবর্দী খাঁর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল। বাংলা মসনদের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সরফরাজ খাঁর আমলের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন।

বলপূর্বক বাংলার মসনদ দখল করিলেও আলিবর্দী খাঁ দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসক ছিলেন না। তিনি যেমন ছিলেন সুশাসক

তেমনি দূরদর্শী। তাঁহার আমলে বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীরদের আক্রমণ বাৎসরিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলিবর্দী যখন মারাঠাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না, তখন বৎসরে বার লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাংলাদেশকে মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন।

ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে আলিবর্দী খাঁর সন্দেহ ও ভয় দুই-ই দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু দূরদর্শী নবাব আলিবর্দী জানিতেন যে, নৌবলে বলীয়ান ইংরেজদের বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করা সহজ হইবে না। এই কারণে তিনি ইংরেজদের প্রতি সতর্ক অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁহার দৌহিত্র মির্জা মহম্মদকে, সাধারণ্যে পরিচিত সিরাজ-উদ্-দৌলাকে, বাংলার পরবর্তী নবাবপদে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলিবর্দীর মৃত্যু হইলে সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) ঃ সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন বাংলার নবাব হন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তেইশ বৎসর। মাতামহ আলিবর্দী খাঁর অত্যধিক আদরে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল, অকর্মণ্য ও অলস হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজনৈতিক জ্ঞান বা শাসনকার্যের জটিলতা সম্পর্কে তিনি কোন প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। মাতামহের মৃত্যুর পর যখন শাসনকার্যের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িল তখন স্বভাবতই তিনি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে সমর্থ হইলেন না। আলিবর্দী তাঁহার তিন কন্যাকেই তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন ভ্রাতুষ্পুত্রই আলিবর্দীর জীবিতকালে মারা গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগমের কোন সন্তান ছিল না। মধ্যমা কন্যা শাহ বেগমের পুত্র ছিলেন সৌকৎ জঙ্গ। কনিষ্ঠা

কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র ছিলেন সিরাজ। আলিবর্দী সিরাজকে নবাবপদে মনোনীত করায় ঘসেটি বেগম ও সৌকৎ জঙ্গ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। ঠিক সেই সময়েই ইংরেজ বণিকদের সহিতও সিরাজ-উদ্-দৌলার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

সেই সময়ে ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা দুর্গ নির্মাণ, পরিখা খনন প্রভৃতি কাজ শুরু করিলে সিরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। ফরাসী বণিকগণ তাঁহার আদেশ মানিল কিন্তু ইংরেজগণ তাহা অমান্য করিয়া চলিল। তদুপরি সিরাজের দূতকেও তাহারা অপমান করিতে ছাড়িল না।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা

এই সকল কারণে সিরাজ পূর্ণিয়ায় সৌকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইবার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই ইংরেজদের শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ (১৭৫৬ খ্রীঃ) করিয়া ইংরেজদের পরাজিত করিলেন। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে এক নৌবহর কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম পুনরায় দখল করিয়া লইল। সিরাজ পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হইল না। আলিনগরের চুক্তি দ্বারা সিরাজ ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলেন। দুর্গ নির্মাণের অনুমতিও তাহাদিগকে দেওয়া হইল [পরবর্তী ঘটনাসমূহ পরে দেওয়া হইয়াছে।]।

বর্গীর উৎপাত : মারাঠাগণ আলিবর্দীর শাসনকালে বাংলাদেশ

পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন চালাইত। সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণ বর্গীরদের আক্রমণের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিত। বর্গীর ভীতি কত বেশী ছিল তাহা সেই সময়কার শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার গানে বর্গীর উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। "ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।" বর্গীরদের অর্থাৎ মারাঠা সৈন্যগণের লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ তাহাদিগকে দিতে হইত। আলিবর্দী খাঁ বৎসরে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিয়া এবং উড়িষ্যা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বর্গীর উৎপাত হইতে দেশরক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজগণকে মারাঠা পরিখা খনন করিয়া এবং কাশিমবাজারের বাণিজ্য কুঠির চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার অনুমতি তিনি দিয়াছিলেন।

(খ) (১) ইওরোপীয় বণিকদের আগমন (Advent of Europeans):

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে জনৈক পোর্তুগীজ বণিক সরাসরি জলপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলে সর্বপ্রথম পোর্তুগীজগণই বাংলাদেশের হুগলীতে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। বাংলাদেশে পোর্তুগীজগণ জলদস্যুতা এবং অপরাপর অত্যাচার শুরু করিলে মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদেশে তাহাদিগকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করা হয়।

ভাস্কো-ডা-গামা

পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ওলন্দাজগণও বাংলাদেশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য শুরু করে। কিন্তু অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। কেবল চুঁচুড়ায় তাহাদের একটি বাণিজ্য কুঠি রহিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম দিকে তাহারা তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ফরাসী বণিকগণ সুরাটে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ইহার পর তাহারা মসুলিপত্তনম, পণ্ডিচেরী এবং বাংলাদেশের চন্দননগর নামক স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করিলে ইংরেজদের সহিত ফরাসীদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

যোসেফ ডুপ্লে

পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইংরেজ বণিকগণও ভারত ও প্রাচ্যের অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য শুরু করিতে অগ্রসর হইল। পোর্তুগীজদের মত বাণিজ্য করিবার সুবিধা যাহাতে ইংরেজ বণিকগণও পায় সেই অনুরোধ করিয়া রাণী এলিজাবেথ সম্রাট আকবরের সভায় দূত পাঠাইলেন। দূতের নাম ছিল জন মিল্‌ডেনহল। পর বৎসর রাণী এলিজাবেথ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ভারতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দিলেন (১৬০০ খ্রীঃ)। এই কোম্পানি প্রথম কয়েক বৎসর সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্রসহ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ বণিকদিগকে সুরাট নামক স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিতে চাহিলে (১৬১১ খ্রীঃ) পোর্তুগীজগণ ইহার বিরোধিতা করিল। ফলে হকিন্সের দৌত্য বিফল হইল। দুই বৎসর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি ফরমান দ্বারা ইংরেজ বণিকগণকে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অধিকার দিলেন।

পোর্তুগীজগণ ইংরেজ বণিকদের বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। এদিকে টমাস রো নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে তিন বৎসর কাটাইলেন (১৬১৫-১৮ খ্রীঃ) এবং মোগল সম্রাটের নিকট হইতে সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি আদায় করিলেন। দক্ষিণ ভারতে এবং বাংলাদেশের হরিহরপুর, হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিল। বিহার, উড়িষ্যা তখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
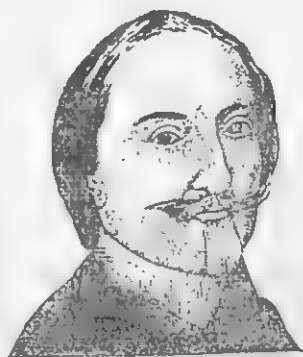
টমাস রো

অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলপূর্বক ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করিল। তাহারা চট্টগ্রাম দখল করিতে গিয়া ব্যর্থ হইল। তাহাদের এই উদ্ধত আচরণে মোগল সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বাই আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এবং যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইল।

এদিকে বাংলাদেশেও ক্রমে ইংরেজ বণিকদের সহিত মোগল সম্রাটের বিরোধের সৃষ্টি হইল। সম্রাট ঔরংজেব তাহাদিগকে পণ্যদ্রব্যের দামের উপর শতকরা দুই টাকা শুল্ক এবং দেড় টাকা জিজিয়া কর দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারিগণ ইংরেজ বণিকদের নিকট হইতে শুল্ক ছাড়াও অর্থ আদায় করিতেন। ইংরেজগণ বলপ্রয়োগ করিয়া এইভাবে কর আদায় বন্ধ করিতে চাহিল। এজন্য হুগলীর বাণিজ্য কুঠিকে তাহারা একটি দুর্গে পরিণত করিতে লাগিল। এই কারণে মোগলদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল এবং ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

কিন্তু জব্ চার্ণক নামে জনৈক বিচক্ষণ ইংরেজ কর্মচারী মোগল সম্রাটের অনুমতি লইয়া সুতানুটি নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সুতানুটি বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার এলাকা। কিন্তু পর বৎসর (১৬৮৭ খ্রীঃ) পুনরায় ইংরেজদের সহিত মোগলদের সংঘর্ষ বাধিলে জব্ চার্ণক সুতানুটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সহিত ঔরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্ত অনুযায়ী জব্ চার্ণক পুনরায় সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিলেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। ঐ বৎসরই সুতানুটি গ্রামে কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরেজগণ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট—এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিল। এজন্য তাহাদিগকে বৎসরে বারশত টাকা খাজনা দিতে হইত। এই তিনটি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী গড়িয়া উঠিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরেজগণ ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ নির্মাণ করিল। ইহার কয়েক বৎসর (১৭১৪ খ্রীঃ) পর জন্ সারম্যান নামক একজন ইংরেজ দূত মোগল দরবারে আসিলেন। ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করাই ছিল এই দৌত্যের উদ্দেশ্য। ইহার ফলে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ার এক ফরমান দ্বারা ইংরেজ বণিকদিগকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই ফরমান গ্রাহ্য করেন নাই।

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে সেই যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত ইংরেজদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধিল। তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন (১৭৫৬ খ্রীঃ)। কিন্তু ঐ বৎসরই ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজ হইতে এক নৌবাহিনা এবং একদল সৈন্য লইয়া আসিয়া ফোর্ট উইলিয়াম পুনরায় দখল করিলেন। নবাব সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এইবার দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল না। সিরাজ আলিনগরের চুক্তি দ্বারা ইংরেজগণকে বাণিজ্যের নানা প্রকার সুযোগ দিলেন এবং বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের এবং দুর্গ

নির্মাণের অনুমতি দিলেন। মুর্শিদাবাদে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি থাকিবেন স্থির হইল।

পলাশীর যুদ্ধ : পরবর্তী ঘটনা খুবই দ্রুত চলিতে লাগিল। রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিলেও সিরাজ-উদ্-দৌলাকে তিনি শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সুযোগ পাইলে সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে নামিবেন তাহাও তিনি স্থির করিলেন। বাংলাদেশে সেই সময়ে ইংরেজদের অপর শত্রু ছিল ফরাসীগণ। চতুর ক্লাইভ সিরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যাহাতে কোন মিত্রতা স্থাপিত না হয় সেজন্য ফরাসীদের বাণিজ্য কেন্দ্র ও ঘাঁটি চন্দননগর দখল করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বাংলাদেশ হইতে তাড়াইবার যেটুকু আশা সিরাজের ছিল তাহা বিনষ্ট হইল। ইহার পর ক্লাইভ নবাবের বিরোধিতা শুরু করিলেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছিল। নবাবের সেনাপতি ও আত্মীয় মিরজাফর ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের নেতা। মিরজাফর ছিলেন আলিবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি। বাংলার নবাব হইবার বাসনা তাঁহারও ছিল। তিনি সিরাজ-উদ্-দৌলার কর্মচারীদের অনেককেই নিজ পক্ষে টানিলেন। মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসের মাধ্যমে তিনি ক্লাইভের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। মুর্শিদাবাদের অর্থলোলুপ শেঠ সম্প্রদায় এবং রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী মিরজাফরের সহিত যোগ দিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন রবার্ট ক্লাইভ এক সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজগণের প্রতারণার সংবাদ পাইয়া সিরাজ-উদ্-দৌলা ক্লাইভকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে পলাশীর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে ভারত-ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিল। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর এবং রায় দুর্লভ নবাবের এক বিরাট সেনাদল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করিলেন না। মিরমদন ও মোহনলালের আপ্রাণ চেষ্টায় ইংরেজ বাহিনী পিছু হটিল। পাশের আমবাগানে তাহারা আশ্রয় লইল। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে মিরমদনের মৃত্যু ঘটিলে একা মোহনলালের উপর যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সম্পূর্ণ ভার পড়িল। মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে ডাকিয়া আনিয়া উপস্থিত বিপদে সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু মিরজাফর সিরাজের হাতাশা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তিনি সিরাজকে যুদ্ধ ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। মোহনলালকে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে এই আদেশ মানিলেন না। কিন্তু সিরাজের পুনঃপুনঃ আদেশে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। ইংরেজগণ একপ্রকার পরাজিত হইয়াও মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়লাভ করিল। সিরাজ আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে ধরা পড়িলে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনা হইল। মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে মহম্মদী বেগ ছুরিকাঘাতে সিরাজকে হত্যা করিল। এইভাবে দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জয় হইল। ইংরেজগণ মিরজাফরকে নবাবপদে স্থাপন করিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজগণ নবাবের দক্ষিণহস্ত রূপে কাজ করিতে লাগিল। ইংরেজ বাণিজ্য কোম্পানি এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইল। নবাবের মসনদের পশ্চাতে ইংরেজগণই প্রকৃত শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।

(খ) (২) বাংলাদেশে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি (Growth of English Power in Bengal)

মিরজাফর ঃ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মিরজাফর বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। ইংরেজদের সাহায্য পাইবার জন্য তিনি ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থ তাহাদিগকে দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নবাব হইয়া দেখিলেন যে, অর্থভাণ্ডারে সেই পরিমাণ অর্থ নাই। আসবাবপত্র, মূল্যবান ধাতুর বাসনপত্র বিক্রয়

করিয়া দেড় কোটি টাকারও বেশী অর্থ ইংরেজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ইংরেজ কোম্পানিকে চব্বিশ-পরগণার জমিদারিও দেওয়া হইল। ক্লাইভ নিজেও বিরাট পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন।

নবাব হইবার পরই মিরজাফর ইংরেজদের পাওনা চুকাইতে গিয়া কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িলেন। অর্থের অভাবে শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিল। পদস্থ কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অন্যায়ভাবে চাপ দিয়া তিনি অর্থ আদায় করিতে চাহিলেন। এমন সময় ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্লাইভের সাহায্য লইয়া তিনি ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিলেন। ইংরেজদের নিকট তাঁহার ঋণ আরও বৃদ্ধি পাইল। এইভাবে মিরজাফর নবাব হইয়াও ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রহিয়া গেলেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিলেন না। ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বাংলাদেশ হইতে বিদায় করিবার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। এজন্য চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ বাটাভিয়া হইতে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজও আনাইল। কিন্তু ক্লাইভ গোপন সূত্রে সংবাদ পাইয়া বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজ নৌবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। তারপর মিরজাফরকে সরাইয়া মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিমকে মসনদে স্থাপন করিলেন। নবাব পরিবর্তন করা তাহাদের নিকট এক লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিল।

মিরজাফর

মিরকাশিম ঃ মিরকাশিম ছিলেন মিরজাফর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি প্রথমেই ইংরেজদের পাওনা সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়া দিলেন। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই

তিনটি জেলা তিনি ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন। তাহাদের প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ইংরেজদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলেও ইংরেজদের তাঁবেদার হইয়া থাকিবার মত হীন মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি স্বাধীন-ভাবেই শাসনকার্য চালাইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। দিল্লী সম্রাটের নিকট হইতে বৎসরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার বিনিময়ে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবপদ স্বীকার করাইয়া লইলেন।

মিরকাশিম

নবাব মিরকাশিম একথা বুঝিয়াছিলেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতে হইবে। এজন্য তিনি সামরু ও মার্কার নামে দুইজন ইওরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে তাঁহার সৈনিকদিগকে পাশ্চাত্য দেশের সামরিক পদ্ধতি শিখাইলেন। কামান ও বন্দুক নির্মাণের ব্যবস্থাও তিনি করিলেন।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বিনা শুল্কে করিবার অধিকার পাইয়াছিল। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণ 'দস্তক' নামে ছাড়পত্র লিখিয়া দিলে বিনা শুল্কে এক স্থান হইতে অপর স্থানে কোম্পানির পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া চলিত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণ দস্তকের অপব্যবহার শুরু করিল। তাহারা দস্তক দেখাইয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র মাল চালান দিত এবং সেগুলি বাংলাদেশের বাজারেই বিক্রয় করিত। এইভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়া দেশীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ফলে দেশের যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদের লোকসান হইতে লাগিল। কারণ শুল্ক দিয়া তাহারা মাল এক স্থান

হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইত অথচ ইংরেজগণ দস্তক দেখাইয়া বিনা শুল্কে মাল চালান দিত। মিরকাশিম ইংরেজ কোম্পানির গভর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি দেশীয় প্রজাদের মালের উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকদের ক্রোধ হইল। পাটনা কুঠির এজেণ্ট এলিস সাহেব মিরকাশিমকে নবাবপদ হইতে সরাইবার উদ্দেশ্যে পাটনা আক্রমণ করিলেন। মিরকাশিম পাটনা হইতে ইংরেজগণকে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনরায় দখল করিলেন। ইহাতে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে মিরকাশিম পরাজিত হইলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সাহায্য লইয়া মিরকাশিম পুনরায় ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মিরকাশিম মস্‌নদচ্যুত হইলেন। আত্মরক্ষার্থ মিরকাশিম পলায়ন করিলেন।

বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধের পর ইংরেজগণকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই। ইহার পর যে-সকল যুদ্ধ হইয়াছিল সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য।

মিরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরেজগণ পুনরায় মিরজাফরকে নবাবপদে স্থাপন করিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই (১৭৬৫ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র নজম্-উদ্-দৌলাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ইংরেজগণ বাংলার মস্‌নদে স্থাপন করিল। মিরকাশিমের পরবর্তী নবাবগণ কেবল নামেমাত্রই নবাব ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হস্তে।

রবার্ট ক্লাইভঃ ক্লাইভ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার, সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের কথা আগেই বলা হইয়াছে। মিরজাফরকে মস্‌নদে বসাইয়া তিনি বাংলার নবাবকে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত করিয়াছিলেন।

বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিবার পর রবার্ট ক্লাইভ প্রচুর পরিমাণ অর্থ লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাইবার পর বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। মিরজাফরকে কপর্দকশূন্য করিয়া দিয়া রবার্ট ক্লাইভ এই অরাজকতার সূত্রপাত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে ইংরেজ কর্মচারিগণও কোম্পানির স্বার্থ না দেখিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাকে লর্ড উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

রবার্ট ক্লাইভ

দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খ্রীঃ) ঃ লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশে পৌঁছিয়া বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সহিত বুঝাপড়া করিতে অগ্রসর হইলেন। সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এলাহাবাদ এই দুইটি স্থান আদায় করিলেন। লর্ডক্লাইভ সম্রাট শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ স্থান দুইটি দান করিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা কর দানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন (১২ই আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ)।

দেওয়ানী গ্রহণ

দেওয়ানী লাভের অর্থ হইল এই যে, ইংরেজগণ সেই সময় হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার লাভ করিল। বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইল। এইভাবে ক্লাইভ বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট শাহ্ আলম—এই তিন জনকেই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিলেন। দেওয়ানী লাভের পূর্বে ইংরেজগণ বাংলার নবাবের পশ্চাতে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করিতেছিল। কিন্তু আইনত তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। দেওয়ানী লাভের পর তাহারা আইনত বাংলার দেওয়ান হইল এবং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার রাজস্বের উপর তাহাদের অধিকার জন্মিল।

ক্লাইভ প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানের কাজ করা তখন ঠিক হইবে না মনে করিলেন। কারণ তাহাতে অপরাপর ইওরোপীয় বণিকের ঈর্ষার সৃষ্টি হইবে। দেওয়ানের কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা এবং দেওয়ানী মামলার বিচার করা। এই উভয় প্রকার দায়িত্বই ক্লাইভ নবাবের উপর আগের মত রাখিয়া দিলেন কিন্তু রাজস্বের মালিক হইল ইংরেজ কোম্পানি। এইভাবে নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজগণ পাইল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এই শাসনব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Double Government) নামে পরিচিত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ দ্বৈত শাসনের ফলে অল্প কালের মধ্যেই প্রজাবর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে জিনিসপত্রের অযথা দাম বাড়িল। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১১৭৬ সনে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খরার জন্য ফসল খুব কম জন্মিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া মাত্র ইংরেজ কর্মচারিগণ এবং

রেজা খাঁ খাদ্যদ্রব্য মজুত করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বহু গুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। বাংলার গ্রামে-গ্রামে, পথে-ঘাটে শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী খাদ্যাভাবে প্রতি দিন হাজারে হাজারে মারা যাইতে লাগিল। বাংলাদেশ এক মহাশ্মশানে পরিণত হইল। ইতিমধ্যে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়িয়াছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ঃ কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। তিনি দ্বৈত শাসনের অবসান করিলেন এবং কোম্পানির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া বিশৃঙ্খলা দূর করিলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ সেই সময়ে মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলাদেশ হইতে যোগাইয়াছিলেন। অর্থের জন্য অযোধ্যার বেগমদের উপর এবং বারাণসীর রাজা চৈত সিংহের উপর অত্যাচার করিতেও ওয়ারেন হেস্টিংস্ দ্বিধাবোধ করেন নাই। যাহা হউক, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন তিনিই সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতে গভর্ণর-জেনারেল হেস্টিংসের অত্যাচার, অবিচার, ইংলণ্ডের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি করিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস্

লর্ড কর্ণওয়ালিস (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ খ্রীঃ)ঃ পরবর্তী এক বৎসর একজন অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল কাজ চালাইলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। ভারতে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধনীতি সম্পূর্ণভাবে

ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসকে বাংলাদেশে পাঠান হইয়াছিল। তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার, ফৌজদারী ও দেওয়ানী ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া আভ্যন্তরীণ শাসনে শৃঙ্খলা আনিলেন। জমিদারগণকে তিনি শান্তি রক্ষা করিবার দায়িত্ব দিলেন। তাঁহার সংস্কারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পূর্বে প্রতি বৎসর জমিদারগণকে তাহাদের অধীনে জমির জন্য ইজারা লইতে হইত। ইহাতে রাজস্বের পরিমাণ কি হইবে তাহা পূর্বে অনুমান করা যাইত না। জমিদারগণ জমির মালিক ছিলেন না এজন্য জমির কোন উন্নতি তাঁহারা করিতেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারগণকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর দিলে তাঁহাদিগকে জমিদারি হইতে সরাইবার কোন কারণ থাকিত না। ইহার ফলে বৎসরে কত রাজস্ব আদায় হইবে তাহা কোম্পানি জানিতে পারিত এবং তাহাতে বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার সুবিধা হইত।

লর্ড কর্ণওয়ালিস

পরিচ্ছেদ—৪

বাংলার নবজাগরণ (Renaissance in Bengal)ঃ মোগল শাসনকালের শেষ দিকে ভারতের জাতীয় জীবনে কোন অগ্রগতি ছিল না। হতাশা, কুসংস্কার ও গতানুগতিকতা সেই সময়কার ভারতবাসী তথা বাঙালীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই আচ্ছন্ন অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠাকেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁস নাম দেওয়া হইয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যেই প্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই বাংলাদেশে এবং পরে সমগ্র ভারতে এক নবচেতনা বা নবজাগরণের সূত্রপাত করিয়াছিল। এই নবজাগরণের প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করিয়া বাংলা-দেশের তথা ভারতের এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ): হুগলী জেলার রাধানগর নামক স্থানে রাজা রামমোহন এক বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (২২শে মে, ১৭৭২ খ্রীঃ, মতান্তরে ১০ই মে, ১৭৭৪ খ্রীঃ)। বাল্যকালেই তিনি সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রামমোহন ইংরেজী, গ্রীক, হিব্রু, সীরীয় প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিয়া এই সকল বিভিন্ন জাতির সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করেন যে, সকল ধর্মই মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, ধর্মীয় বা সামাজিক বাধানিষেধের কোন প্রকৃত মূল্য নাই। কুসংস্কার হইতেই এগুলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এজন্য তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে চাহিলেন। এজন্য ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের গোড়াপত্তন করেন।

রাজা রামমোহন রায়

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে; শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি এক নূতন আদর্শের এবং নবযুগের প্রবর্তন করিতে চাহিলেন। বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে রাজা রামমোহনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি

দিয়াছিলেন দিল্লীর বাদশাহ্। রসায়ন শাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে যাহাতে ভারতেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য রাজা রামমোহন সেই সময়কার বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমহার্স্ট সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার উপরই গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহনের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে রামমোহন দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার এবং ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে এই কলেজই প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হয়।

ডেভিড্ হেয়ার

রাজা রামমোহন কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি-সাধন, জাতিভেদ প্রথা দূর করা, নারীজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া, তাঁহাদিগকে সম্পত্তির অংশ দেওয়া, প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যের জন্য রাজা রামমোহন অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলা—এই সকল

লর্ড বেন্টিঙ্ক

চেষ্টা রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা চলিয়াছিল।

সতীদাহ প্রথার অবসানের জন্য চেষ্টা ভারত-ইতিহাসে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। রাজা রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ শাসকদের চক্ষে ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারেও রাজা রামমোহনের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভাগলপুরের কালেক্টর হ্যামিলটন সাহেব তাঁহাকে অমর্যাদা প্রদর্শন করিলে তিনি বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হ্যামিলটন সাহেবকে তিরস্কৃত করাইয়াছিলেন।

এইভাবে রাজা রামমোহন রায় ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, জাতীয়তা আন্দোলন, শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ সবকিছুই রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিল। রামমোহন রায় ছিলেন বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁসের—অর্থাৎ নবজাগরণের প্রবর্তক।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের কার্যকলাপে অত্যধিক আগ্রহী হইয়া উঠেন। রাজা রামমোহন রায়ের আরব্ধ কার্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ সেই সময় হিন্দু স্ত্রীলোক ও পুরুষকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিতেছিল। সেই সময়ে শিক্ষিত হিন্দু যুবসমাজে হিন্দু ধর্মের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের উদ্রেক করিয়া বিভ্রান্ত হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ হইতে নিরস্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।
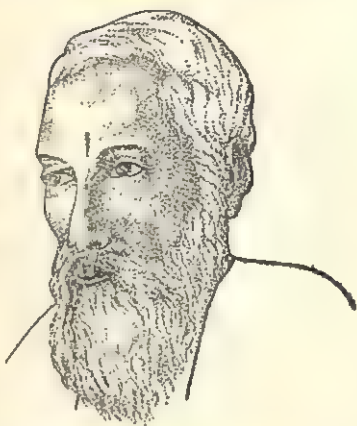
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির জন্যও দেবেন্দ্রনাথের দান উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করাই ছিল তাঁহার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হরিশ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থাৎ তখনকার সরকারের সকল বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নিয়োগ করিবার জন্য আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলে লবণ কর ও চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরোধিতা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান নামক এক অতি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থার সম্পাদক রূপে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন তখন এই অ্যাসোসিয়েশান ভারতে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের লইয়া আইনসভা গঠনের দাবি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার গভীর মানবিকতা ও ধর্ম ভাবের জন্য 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রীঃ): মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর)। স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। তাঁহার কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ সরকার তাঁহাকে অধ্যক্ষের দায়িত্বের উপর বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ও নদীয়ার স্কুলসমূহের পরিদর্শক অর্থাৎ ইন্স্‌পেক্টর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উদ্ধত ব্যবহার এবং তাঁহাকে স্থায়ী ইন্স্‌পেক্টরপদে নিয়োগ না করায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহসী পুরুষ। ভারতীয়দের প্রতি ইওরোপীয় রাজকর্মচারীদের উদ্ধত ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের তীব্র প্রতিবাদ বাঙালীর অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাঁহার অনাড়ম্বর সাদা-সিধা চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ ধুতি, চাদর ও তালতলার চটিজুতা লইয়া পদস্থ সাহেবদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও চলাফেরা তাঁহার দৃঢ় আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক ছিল।

সরকারী চাকরি ত্যাগ করিলেও সমাজসেবা এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশান স্থাপন করিয়া হিন্দু মধ্যবিত্ত যুবকদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে এই বিদ্যায়তনই একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। বাংলা ভাষায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেমন উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন তেমনি বাংলা শিক্ষার পথ সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইনত স্বীকৃত হইয়াছিল। মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশও বিধবা পাইবে তাহাও স্বীকৃত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কাজে এবং কথায় কোন প্রভেদ রাখিতেন না। তিনি নিজ পুত্রের সহিত এক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহু বিবাহ করিতেন। এই কু-প্রথার অবসান করিবার জন্যও তিনি আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবন ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁহার অশেষ উৎসাহ ছিল। দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া, ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রসার সাধন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙালীদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কর্তৃক যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল তাঁহার মূর্ত প্রতীক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার পাণ্ডিত্য, উদার মনোবৃত্তি, নির্ভীকতা, মানবিকতা তাঁহাকে বাঙালীর অন্তরে এক চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯ খ্রীঃ)ঃ চব্বিশ-পরগণা জেলার বোয়াল নামক গ্রামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মিশ্রিত প্রভাব ছাত্র অবস্থায় রাজনারায়ণের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে ইংরেজীর শিক্ষক হিসাবে কাজ করিবার পর তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ হইবার শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা যাহাতে দেশকে ভালবাসিতে শিখে, তাহাদের অন্তরে যাহাতে জাতীয়তাবোধ বদ্ধমূল হয় সেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান করিলেই বাঙালী তথা ভারতীয়দের প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা যাইবে একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। সেই সময়ের ইংরেজ সরকার বাংলা ভাষার প্রতি যে অবহেলা প্রদর্শন করিতেন তাহার বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ বসু তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে ত্রুটি করেন নাই।

সমাজ-সংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে রাজনারায়ণ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব দিক দিয়া সেই সময়ে বাঙালীদের মধ্যে সাহেবদের অনুকরণ করিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। রাজনারায়ণ এই ধরনের অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। ইংরেজদের চরিত্রের এবং আচার-আচরণের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ কেবল তাহা গ্রহণের কথা তিনি বলিতেন। কিন্তু নিছক অনুকরণপ্রিয়তার তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রচলিত বিধবা-বিবাহের তিনি দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিধবার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ কিভাবে জাগাইয়া তোলা যায় সেই সকল উপায় বর্ণনা করিয়া রাজনারায়ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় বাঙালী যুব সমাজকে আমাদের দেশীয় খেলাধুলা, দেশীয় ঔষধপত্র ব্যবহার, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিতে তিনি উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। নিজের ভাষায় কথা বলা, ইংরেজদের অনুকরণ না করা, হিন্দু শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ নীতির উপর নির্ভর করিয়া সমাজ-সংস্কার করা, প্রভৃতির উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর নিকট প্রেরণা পাইয়াই নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙালীদের দ্বারা প্রস্তুত নানা প্রকার সামগ্রী, বাংলা ভাষায় রচনা-প্রতিযোগিতা, দেশীয় ব্যায়াম প্রভৃতি সবকিছুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই মেলায় করা হইত। হিন্দু মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তোলা এবং আমাদের যাহা কিছু নিজস্ব সেই দিকে যুব সমাজের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া। সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক এবং আদর্শ শিক্ষক হিসাবে রাজনারায়ণ বসুর নাম অবিস্মরণীয়।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ): বাংলার নবজাগরণে কেশবচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে জড়িত। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে গভীরভাবে পড়াশুনা শুরু করেন এবং ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন

কেশবচন্দ্র সেন

প্রথম সারির নেতা হইয়া দাঁড়ান। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও

প্রসারের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদ দূর করা, এক জাতির লোকের সহিত অপর জাতির লোকের বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি উদার মত পোষণ করিতেন। তাঁহার অত্যধিক উদার মতবাদের সহিত শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অমিল ঘটিল। কেশব সেন আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পৃথক সমাজ স্থাপন করেন। তিনি ভারতের বিভিন্নাংশে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া ফিরিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডেও তাঁহার প্রচারকার্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয়দের মধ্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার করা উচিত সেই দাবি তিনি করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য সস্তায় পুস্তক সরবরাহ করিতে শুরু করেন।

কেশবচন্দ্র ধর্মের সহিত শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ঈশ্বর এবং ধর্মের প্রতি অবহেলা দেখাইলে দেশের সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে, একথা কেশবচন্দ্র সেন বিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিজ্ঞান না বাড়িলে সেই শিক্ষায় দেশপ্রেম জাগাইতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে তিনি তাঁহার বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকারকেও আইন পাশ করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার, তাঁহাদিগকে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন এই মত তিনি পোষণ করিতেন। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের তিনি সমর্থক ছিলেন।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং জাতির লোকের মধ্যে অবাধভাবে খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়া জাতিভেদের কঠোরতা দূর করিতে পারা যাইবে এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া তোলা যাইবে, এই

ছিল তাঁহার মত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকে তিনি সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দেশপ্রেমিক হিসাবেও কেশবচন্দ্রের স্থান খুবই উচ্চে। তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির প্রতি যার যার কর্তব্য করিতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মূল নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। স্কুল বা কলেজের শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মোটেই ছিল না। তিনি প্রথমে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পুরোহিতের কাজ করিতেন। সেই কাজ করিতে করিতে তিনি কালীমাতার কৃপালাভে সমর্থ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্ম, ইস্‌লাম ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের সার গ্রহণের জন্য এই তিন ধর্মই অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ফলে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পথ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সব পথই পরম ঈশ্বরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, শৈব, বৈষ্ণব এরূপ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব দেখিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। কারণ এই সকল ধর্ম একই ঈশ্বরের আরাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের প্রতীক-স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মধ্য দিয়া তিনি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের পথই দেখাইয়া গিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সেই সময়ে বাঙালী তথা ভারতীয়দের

মধ্যে হিন্দু ধর্মের উপর আস্থা হ্রাস পাইতেছিল। সাহেবদের অনুকরণে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করা তখন শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষামুক্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার সহজ ও সরল এবং অকৃত্রিম বাণী ও ভাব দ্বারা হিন্দু ধর্মের মূল শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তিনি হিন্দু ধর্মকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করিয়াছিলেন।

অতি সাধারণ ভাষা ও উপমার মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ, উপনিষদের প্রকৃত শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি হিন্দুদিগকে হিন্দু ধর্মের নিহিত শক্তি সম্পর্কে বুঝাইয়া দিয়া হিন্দু ধর্মের উপর তাহাদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে সমাজসেবা, স্বার্থত্যাগ, জীবমাত্রেরই প্রতি প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণের উন্মেষ তিনি করিয়াছিলেন। সমাজের নৈতিক মান তিনি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এবং ভারতের বাহিরে জীবে প্রেম ও জীবের সেবাই হইল প্রকৃত ধর্ম, একথা প্রচার করিয়া সমাজ ও ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ব্যাপারে সহিষ্ণুতা, সত্যের সন্ধান ও মানুষ এমনকি জীবমাত্রেরই সেবা তাঁহার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা দান করিয়াছিল। নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের কাছে এই মহামানব ভারতের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতার এক বিরাট শক্তির উৎস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪ খ্রীঃ)ঃ বাঙালী ও বাংলাদেশের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। হুগলী মহসীন কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে সর্বপ্রথম দুইজন বি. এ. পাশ ছাত্রের একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐ বৎসরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটপদে নিযুক্ত হন।

আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষ গুণ। তাঁহার আত্মমর্যাদায় এতটুকু আঘাতও তিনি সহ্য করিতেন না। এজন্য তিনি একাধিকবার উচ্চপদস্থ ইওরোপীয় কর্মচারীদের সহিত ঝগড়া করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। একবার তিনি পালকি করিয়া ইওরোপীয়দের ক্রিকেট খেলার মাঠ পার হইয়াছিলেন বলিয়া লেফট্যানান্ট কর্ণেল ডাফিন বঙ্কিমচন্দ্রের গায়ে হাত দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিন সাহেবের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা করিয়া সকলের সম্মুখে তাঁহাকে মাপ চাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকরি করিলেও তাঁহার অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অন্তর। তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নানা প্রকার ত্রুটি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরিতেও ভয় পান নাই। 'বাংলা শাসনের কল' ও 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' নামক তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা ইহার দৃষ্টান্ত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তাঁহার রচনা যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিল তেমনি সমাজের নৈতিকতা ও দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিল। শিক্ষিত বাঙালীদিগকে তিনি বাংলা ভাষা কথায় এবং লেখায় ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমাজে জাতিভেদ প্রথা,

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার-অবিচার প্রভৃতির তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং এজন্য স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তিনি চাহিয়াছিলেন। কৃষকদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারের অন্যতম আদর্শ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসার। দেশপ্রেম সকল ধর্মের উপরে ধর্ম এই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীদের শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে দেশপ্রেমের যে শিক্ষা তিনি দিয়াছিলেন তাহা বাঙালী এবং ভারতীয়দের মধ্যে এক গভীর দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গান স্বদেশপ্রেমের বীজমন্ত্র স্বরূপ সমগ্র ভারতে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং আজিও হইতেছে। এই গানই আজ স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ভিন্ন, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কমলাকান্ত', 'বাঙালীর বাহুবল' প্রভৃতি প্রবন্ধ বাঙালীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার রচনা বাঙলার যুব সমাজের মনে এক নূতন চেতনা ও সাহস আনিয়া দিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী ও ভারতীয়দের মধ্যে দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির মানসিক প্রস্তুতি আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জাগ্রত বাংলার জ্ঞানতপস্বী ঋষি।

পরিচ্ছেদ—৫

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খ্রীঃ (Bengal Partition, 1905) : বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা, ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রকার দাবি বাঙালীদের মধ্য হইতেই শুরু হয়। এই সকল স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের ভাল লাগিল না। সেই সময় বাংলা প্রদেশ বিহার-উড়িষ্যা-বাংলা লইয়া গঠিত ছিল। লর্ড কার্জন

গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় হইয়া আসিলে ব্রিটিশ সরকারের নীতি আরও কঠোর হইয়া উঠিল। বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি যাহাতে প্রসারলাভ না করে সেজন্য নানা প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইল। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা, সভা-সমিতিতে উপস্থিত হওয়া অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করা হইল। এই

লর্ড কার্জন

সকল কারণে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এমন সময় লর্ড কার্জন শাসনের সুবিধার অজুহাতে বাঙালীদের বিভক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া ইস্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন (১৯০৫ খ্রীঃ)। বাঙালী জাতির ঐক্য বিনষ্ট করিয়া তাহাদের জাতীয় আন্দোলন ক্ষমতা হ্রাস করাই ছিল বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশ ভাঙিয়া দুই ভাগ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গকে বাংলাদেশ হইতে পৃথক করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের একতা বিনাশ করাও ছিল কার্জনের অভিসন্ধি।

বাঙালী জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও এই প্রতিবাদের সামিল হইল। বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালী সমাজ—ধনী, দরিদ্র, জমিদার, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, ছাত্র, স্ত্রীলোক, এমন কি শহরাঞ্চলের একেবারে দরিদ্র ব্যক্তিরাও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করিল। বাঙালীদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের ঐক্য উপেক্ষা করিয়া বাঙালী জাতিকে ব্রিটিশের রাজনৈতিক স্বার্থে ভাগ করা বাঙালী জাতি

কোনমতেই মানিতে চাহিল না। বাঙালী নেতৃবর্গের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গভঙ্গ রোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইল। ইহার পর এই আন্দোলন বাংলার গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগরে বিস্তারলাভ করিল। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশ কার্যকর হইল। ঐ দিনটি বাংলার সর্বত্র জাতীয় শোকদিবস বলিয়া পালন করা হইল। হরতাল এবং উপবাসে কাটাইয়া বাঙালী জাতি কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে একটি গান রচনা করিলেন। বাঙালীরা দল বাঁধিয়া এই গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় চলিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি কলিকাতার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। বাঙালীর ঐক্য দেশকে ভাগ করিয়া নষ্ট করা যাইবে না, এই ঐক্য অটুট একথা সকলে যাহাতে উপলব্ধি করে সেজন্য রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান করিলেন। হিন্দু, মুসলমান সকলে একে অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়া বাঙালীরা ভাই ভাই এই কথার প্রমাণ দিলেন। বাঙালী মনীষী ও জাতীয়তাবাদী নেতা আনন্দমোহন বসু 'ফেডারেশন হল' নামে একটি সভাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। বাঙালী মাত্রেই অবিচ্ছিন্ন ইহার প্রতীক হিসাবেই এই সভাগৃহের নাম দেওয়া হইল 'ফেডারেশন হল'।

কেবল সভাসমিতি ও বক্তৃতা করিয়া বঙ্গভঙ্গ রোধ করা যাইবে না একথা বাঙালী নেতাদের বুঝিতে দেরী হইল না। এজন্য ব্রিটিশদের স্বার্থে আঘাত করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। বিলাতী দ্রব্য বয়কট করা,

পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জন করা শুরু হইল। স্বদেশজাত দ্রব্যাদি বৈদেশিক পণ্য হইতে নিকৃষ্ট হইলেও ব্যবহার করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রেও জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করা হইল। এজন্য 'জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ্' (National Council of Education) নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইল। ইহার অধীনে কলিকাতায় একটি স্কুল এবং একটি কলেজ স্থাপিত হইল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। দেশবাসী দ্বারা পরিচালিত এবং দেশের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দেওয়াই ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সর্বক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাশ প্রভৃতি স্বদেশী গান রচনা করিয়া গানের মধ্য দিয়া স্বাদেশিকতা শিক্ষা দিলেন। তখনকার ছাত্র সমাজ বিলাতী কাপড়ের দোকানে বা যেখানেই বিলাতী জিনিস বিক্রয় হইত সেখানে পিকেটিং করিতে লাগিল। তাহাদের চেষ্টায় বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশী জিনিসপত্রের উপর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কাজের জন্য ছাত্রদিগকে

রজনীকান্ত সেন

ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের লাঠি, স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি সহিতে হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনে স্ত্রীলোক এবং বহু গণ্যমান্য মুসলমানও যোগদান করিয়াছিলেন। ঢাকার নবাবের প্রভাবে অবশ্য অনেক মুসলমান এই আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারতের অপরাপর অঞ্চলে বালগঙ্গাধর তিলকের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলন চালু হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য আন্দোলন এবং সেই সূত্রে স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালীদের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভিত্তি এই আন্দোলনের ফলেই রচিত হইয়াছিল।

বালগঙ্গাধর তিলক

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী ভারতে আসেন। এই উপলক্ষে দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই ডিসেম্বর এই দরবারে এক ঘোষণা দ্বারা বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইল। এইভাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়াছিল উহা সফল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সরাইয়া লইলেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী নেতৃবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রীঃ)ঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল উহার

অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের দান ছিল অপরিসীম।

সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা দেশের সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার কাজের মধ্য দিয়া সুরেন্দ্রনাথ বাঙালী ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম ও সমাজসেবার মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা সেই যুগের যুব সমাজের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব পালন করিয়া তিনি বাঙালী জাতিকে শিবাজীর বীরত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একতা, ভারতীয়দের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও জনমত প্রকাশের সাহস বৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টার শেষ ছিল না। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান' নামে এক রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ রোধ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় সরকারী কাজের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ করিয়া যে আইন পাশ হইয়াছিল (Vernacular Press Act) তাহার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই আইন বাতিল হইয়াছিল। পৌরসভাগুলিতে পূর্বে সরকার কর্তৃক সদস্য মনোনীত হইতেন। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙালীরা আন্দোলন করিয়া সদস্য নির্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতীয়দিগকে আন্দোলন করিবার রীতি শিখাইয়া গিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতীয় নেতা যিনি দেশের সেবা করিতে গিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের ভিত্তি তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬ খ্রীঃ) ঃ ভারতে জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের অপর একজন ছিলেন আনন্দমোহন বসু। দেশপ্রেম ও সমাজ চেতনা তাঁহার চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কেম্‌ব্রীজে পড়াশুনা করিতে গিয়া এক সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উহা হইতে তাঁহার গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

আনন্দমোহন বসু

সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থাপিত ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক সমিতিতে রূপান্তরিত করিতে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে 'কলিকাতা ছাত্র সঙ্ঘ' নামে একটি সমিতিও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় সভার (National Conference) অধিবেশনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন আনন্দমোহন।

এই সভায় ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে এই সভাকে ভারতের জাতীয় পার্লামেন্টের পথে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আনন্দমোহনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁহার স্থাপিত 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' পরে বেথুন স্কুলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বর্তমানে কলিকাতার বেথুন স্কুলে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সিটি স্কুল স্থাপনেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল। ইহাই পরে সিটি কলেজে পরিণত হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন আনন্দমোহন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এই অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া তিনি রাখীবন্ধন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ)। পর বৎসরই তিনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ): বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিসম্রাটই ছিলেন না, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের মধ্যে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে ভারতীয়রা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথ আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁহার রচিত জাতীয়

স্বদেশী যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গীতগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে বাঙালী জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, একত্ববোধ ও দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিতে হইলে মাতৃভাষায় বক্তৃতা ও প্রচারের প্রয়োজন একথা তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতি প্রায় সকল নেতাই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা ও প্রচার চালাইতেন। হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপরও রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন একথা তিনি বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই রাখীবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই ভাই এই মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে কেবল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইলেই চলিবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি তিনি ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেশপ্রেম, স্বজাতি প্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা ছিল তাঁহার জীবনের মূল আদর্শ। দেশপ্রেমকে তিনি 'ধর্ম' বলিয়া মনে করিতেন।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রীঃ)ঃ বাংলার রাজনীতিতে অরবিন্দের প্রবেশ ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য অরবিন্দের ডাক পড়িল। আত্মত্যাগী ও স্বার্থত্যাগী অরবিন্দ বরোদা কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহার মাসিক বেতন স্থির হইল পঁচাত্তর টাকা। বরোদা কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল সাতশত পঞ্চাশ টাকা। অরবিন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম ছিল তাঁহার কাছে

ধর্মস্বরূপ। দেশের সেবাকে তিনি পুণ্য কাজ, ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। স্বদেশকে তিনি মা বলিয়া মনে করিতেন। "মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটি রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত-ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?" স্ত্রীর নিকট লেখা অরবিন্দের চিঠির এই কয়েকটি কথায় অরবিন্দের দেশ-প্রেম যে কত গভীর ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি ভারতমাতার রক্তপানে উদ্যত রাক্ষস বলিয়াই মনে করিতেন।

শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দ কিছুকাল পর অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদন শুরু করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার লেখা সেই সময়কার বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে বিপ্লব সমিতি গঠনের কল্পনা করিতেন। বাংলার বিপ্লবিগণ তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের হাতেখড়ি অরবিন্দের নিকটই হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় এই মকদ্দমায় তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে (১৯১০ খ্রীঃ) অরবিন্দ তখনকার ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলিয়া যান। সেইখানে তিনি তপস্যায় মগ্ন হন। রাজনীতি হইতে সেই সময় হইতে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রীঃ) : স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচারক

ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁহার বাগ্মিতা এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁহার লেখা স্বদেশী আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের কালে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য বিপিনচন্দ্র ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালীদের মধ্যে গভীর উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ জাগাইয়া তোলার ব্যাপারে বিপিনচন্দ্রের দান ছিল অপরিসীম। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য কেবল বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা একথা তিনি মনে করিতেন না। তিনি এই আন্দোলনকে স্বরাজ—অর্থাৎ ভারতীয়দের নিজ হস্তে শাসনক্ষমতা পাইবার আন্দোলনে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বরাজের জন্য তিনি ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করিয়া যুব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা ভারতবাসীদের মধ্যে দেশপ্রেম, সমাজসেবা ও জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল

অরবিন্দের সহিত বিপিনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আলিপুর মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার ছয় মাস জেল হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খ্রীঃ) ঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে এক নূতন অধ্যায় শুরু হইল। বাঙালী জাতির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এই অন্যায়ের

প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন আগাইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব হইতেই অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির সহিত চিত্তরঞ্জনের যোগাযোগ ছিল। দেশ সেবার কাজও তিনি করিতেছিলেন। কিন্তু কার্জনের বঙ্গভঙ্গ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে নামাইয়া আনিল। ঐ বৎসর দার্জিলিংয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন করিয়া এক অতি সুন্দর বক্তৃতা দেন। বাঙালী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য তিনি বলিতেন। তিনি জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইলে উহার অধীনে একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের চাকরি ছাড়িয়া কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতার ন্যায় ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজে, অরবিন্দ, বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী। তাঁহারা কার্যকরভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতায় পক্ষপাতী ছিলেন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় চিত্তরঞ্জনের চেষ্টাতেই অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন গোপনে বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর সংস্রবে আসিয়া চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক হন। তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আইনজীবী হিসাবে তাঁহার বিশাল আয় তিনি ত্যাগ করিয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত হইয়াছিলেন। সেজন্য দেশবাসীর পক্ষে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়াছিলেন।

পরিচ্ছেদ—৬

বাংলার বিপ্লবিগণ (Revolutionaries of Bengal)

পটভূমিকা ঃ স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশেই শুরু হইয়াছিল। ইহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বাঙালীরা। ব্রিটিশ স্বার্থ বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা আঘাত পাইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী সেজন্য বাঙালীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচার যতই কঠোর হইতে লাগিল বাঙালীর দৃঢ়তা ততই বাড়িতে থাকিল। সেই সময়কার কংগ্রেসী নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন নরমপন্থী। ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করিয়া কতক অধিকার আদায় করিতে পারিলেই তাঁহারা খুশী। তাঁহারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু এই নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের আন্দোলন সকলের পছন্দ হইল না। অরবিন্দ, বিপিন পাল, মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের ইঙ্গিত দিলেন।

লালা লাজপৎ রায়

এদিকে বাংলার যুব সমাজ জাগিয়া উঠিয়াছে। কার্জনের দেশ-বিভাগ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতই অপমানজনক ও নির্মম বলিয়া উহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতিতে তাহারা তখন বীতশ্রদ্ধ। ভিক্ষার পাত্র লইয়া তাহারা ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদনের বিরোধী। বাঙালী যুব সমাজ যখন এইভাবে উত্থিত ও জাগ্রত তখন ব্রিটিশ শাসকবর্গের অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল। শাসকশ্রেণী দেশ-প্রেমের বন্যাকে রোধ করিবার জন্য তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। নিরস্ত্র বাঙালী বৈদেশিক জিনিসপত্রের দোকানে পিকেটিং করিলে,

এমনকি কোন সভাসমিতিতে যোগদান করিলেও পুলিশের লাঠি খাইতে হইত। যুব সমাজ যাহাতে রাজনীতির সংস্পর্শে না আসে সেজন্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদের উপর নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। এমনকি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইল।

সুশীল সেন

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়া বাংলার গণ্যমান্য নেতাগণ পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হইলেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের আদালত প্রাঙ্গণে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি দিবার অপরাধে চৌদ্দ বৎসরের কিশোর সুশীলকে কিংস্‌ফোর্ডের আদেশে পনের ঘা বেত মারা হইল। বাংলার যুব সমাজের ধৈর্যের আর বাঁধ মানিল না। কিংস্‌ফোর্ডের অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়ার ব্যবস্থা চলিল।

বাংলাদেশে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সূত্রপাত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। বিপ্লবীদের আদি মন্ত্রগুরু ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বরোদায় চাকরি করিবার কালে তিনি বঙ্কিমের আনন্দমঠের আদর্শে বিপ্লবী সমিতি গঠনের কল্পনা করিতে-ছিলেন। সুযোগও তাঁহার আসিল। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবককে তিনি বরোদার সেনাবাহিনীতে ঢোকাইলেন। সেই সময়ে বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় নাম দিয়া সেনাবাহিনীতে

বারীন্দ্র ঘোষ

দেওয়া হইল। সামরিক শিক্ষা শেষে যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের আদেশে সেনাবাহিনী ছাড়িয়া দিয়া বিপ্লবী সমিতি গঠনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ এই কাজে তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না। অরবিন্দ নিজ ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষের উপর এই দায়িত্ব দিলেন। বারীন্দ্রনাথ কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি নাম দিয়া এক গোপন বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করিলেন। সেই যুগের যুগান্তর পত্রিকা অফিসে বিপ্লবীদের এই গোপন আস্তানা গড়িয়া উঠিল। পুলিশের নজর পড়িলে সেখান হইতে মুরারিপুকুরের এক বাগান বাড়ীতে উহা স্থানান্তরিত করা হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ উহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনিও মুরারিপুকুরের বাগান বাড়ীতে আসিতেন। মুরারিপুকুরের বাগানে বিপ্লবী সমিতির যুবকরা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, রিভল্‌ভার চালান, বোমা তৈয়ার করা, প্রভৃতি শিখিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ও কুস্তি করিয়া শরীরকে সবল করিত। বাংলার বিপ্লবীদের অনেকেই এই আখড়ার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, সত্যেন বসু,

সত্যেন বসু

কানাই দত্ত

কানাইলাল প্রভৃতি সকলেই ছিলেন এই গোপন সমিতির বিপ্লবী কর্মী। ঢাকা ও মেদিনীপুরে এই সমিতির শাখা খোলা হইল।

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নিষ্ঠুর অত্যাচার আর মুখ বুজিয়া সহ্য করা হইবে না, বিপ্লবীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। অত্যাচারী ইংরেজ

রাজকর্মচারীদিগকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। বিপ্লবীরা জানিতেন যে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান যাইবে না। বরং এই চেষ্টায় তাঁহাদিগকে প্রাণ দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা চাহিয়াছিলেন দেশসেবার কাজে জীবন তুচ্ছ করিয়া, জীবনকে নিঃশেষে দান করিয়া মেরুদণ্ডহীন, পরাধীন ভারতীয়দের সাহস বাড়াইয়া দিতে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা তাঁহাদের কাছে সব কিছুর উপরে। দেশমাতা নিজ মায়েরই সামিল। মায়ের উপর অত্যাচার যেমন কোন সন্তানই সহ্য করিতে পারে না, দেশমাতার উপর বিদেশী শাসকদের অত্যাচারও তেমনি তাঁহারা সহ্য করিবেন না। এজন্য তাঁহারা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ বাছিয়া লইলেন। মরণকে কিভাবে জয় করিতে হয়, দেশের স্বাধীনতার কাছে আর কিছুই বড় নহে, এই সত্যই তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ভারতবাসী যাহাতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহাই ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। এজন্য তাঁহারা ফাঁসির দড়ি মালার মত গলায় পরিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই। বিপ্লবীরা এ-বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গোয়েন্দাদের একথা জানিতে বিলম্ব হইল না। বিপ্লবীদের হাত হইতে কিংস্‌ফোর্ডকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে মজঃফরপুর বদলী করা হইল। কিন্তু তাহাতেও বিপ্লবীরা নিরস্ত হইলেন না। প্রফুল্ল চাকী ও মেদিনীপুরের যুবক ক্ষুদিরামকে বোমা ও পিস্তলসহ মজঃফরপুর পাঠান হইল।

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্রীঃ) : মজঃফরপুরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল যুগান্তর দল কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলবশত ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা যে গাড়ীতে যাইতেছিলেন, সেই গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই মারা গেলেন। পরদিন সকালে ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন। মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে (১৮৮৮-১৯০৮ খ্রীঃ) পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে গেলে তিনি নিজ

রিভলভার হইতে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইল। এইভাবে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুইজন শহীদ হইলেন। ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী যুগের—অর্থাৎ অগ্নি যুগের প্রথম ফাঁসির শহীদ। বিচারকালে উনিশ বৎসরের যুবক ক্ষুদিরামের নির্ভীকতা এবং সাহসিকতা দেশের সকলকে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়াছিল। বিদেশী সরকার তাঁহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইলেও ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির অন্তরে ক্ষুদিরাম অমর ও অক্ষয় হইয়া রহিলেন। বাল্যকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন ক্ষুদিরাম দেশমাতার মধ্যেই নিজ মায়ের প্রতিকৃতি দেখিয়া-ছিলেন। এই মায়ের সেবায়ই তিনি প্রাণদান করিয়া বাঙালী যুব সমাজকে মৃত্যুভয় জয় করিবার প্রেরণা দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এই আত্ম-বলিদান আপাতদৃষ্টিতে ফলপ্রসূ না হইলেও ইহার নৈতিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এই আত্ম-বলিদান হইতেই অগ্নি যুগের সূচনা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

প্রফুল্ল চাকী

ক্ষুদিরাম বসু

ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িয়াছিলেন তার পরদিন বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় পুলিশ হানা দেয়। অরবিন্দ সহ মোট ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দকে শাস্তি দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য। তিনিই যে বিপ্লবীদের মন্ত্রগুরু একথা জানিতে তাহাদের বাকী ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় অরবিন্দ বেকসুর খালাস পাইলেন। এই মকদ্দমা চলা

কালে নরেন গোঁসাই নামে বিপ্লবীদেরই একজন রাজসাক্ষী হইল। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন গোঁসাই বিপ্লবী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সব কিছু বলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল সেজন্য নরেন গোঁসাইকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাহিলেন। তাঁহারা বাহির হইতে গোপনে পিস্তল আনাইলেন। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যেই তাঁহারা নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। বিচারে সত্যেন এবং কানাইলাল উভয়েরই ফাঁসি হইল। আলিপুর মামলার আসামীদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া পাইলেন। উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীন ঘোষ প্রভৃতি অপরাপর সকলের দ্বীপান্তর হইল।

দেশমাতার সেবায় বিশ্বাসঘাতকদের যে স্থান নাই সত্যেন ও কানাইলাল তাঁহাদের জীবন দিয়া একথাই প্রমাণ করিলেন। তাঁহাদের আত্মত্যাগ ও দুর্জয় সাহস বিপ্লবীদের সম্মুখে ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আলিপুর মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। বাংলার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বহু গোপন সমিতি গড়িয়া উঠিল। এগুলির মধ্যে অবশ্য অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতি ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ঢাকা ও মেদিনীপুরে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন হইলেও বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে গোপন যোগাযোগ ছিল। সরকারের কঠোর অত্যাচার বিপ্লবীদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলেও তাঁহাদিগকে দমন করিতে পারিল না। বরং তাঁহাদের উৎসাহ বহু গুণে বাড়াইয়া দিল। বিপ্লবী আন্দোলন পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতের অপরাপর অংশে ছড়াইয়া পড়িল।

রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫ খ্রীঃ) : সেই সময়কার বাঙালী বিপ্লবীদের একজন দুঃসাহসী নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে রাসবিহারী ও বাঘা যতীন সমগ্র ভারতে এক দ্বিতীয় বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে একটি বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহের দিনও স্থির

হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবীদেরই একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিল। রাসবিহারীর অনুচরগণ সকলেই ধরা পড়িলেন। রাসবিহারী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি। চন্দননগরে পড়াশুনা করিবার সময় হইতেই তাঁহার দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি ও দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল উত্তর-ভারত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করিলেও কলিকাতা হইতে তাঁহারা রাজধানী দিল্লীতে সরাইয়া লইলেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পর বৎসর নূতন রাজধানীতে জাঁকজমকের সহিত প্রবেশ করিবার দিনে এক শোভাযাত্রা বাহির হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতীতে চড়িয়া এই শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হইলেন। দর্শকদের ভীড়ের মধ্যে অসংখ্য পুলিশও ছিল। কিন্তু রাসবিহারী দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। হার্ডিঞ্জ আহত হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহার একজন ভারতীয় সহযাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা গেল। রাসবিহারীর গ্রেপ্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। কিন্তু বিপ্লবী রাসবিহারীকে ধরা সম্ভব হইল না। তিনি পাঞ্জাবে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজ নির্বিঘ্নে করিয়া চাললেন। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহার অনুচরগণ ধরা পাড়লে তিনি রাজা পি. এন্. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে চলিয়া যান। পরবর্তী কালে তি'ন নেতাজী সুভাষের সঙ্গে যোগদান করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাসবিহারী বসু

বাঘা যতীন (১৮৭০-১৯১৫ খ্রীঃ) : বাঙালী বিপ্লবীদের সর্বপ্রধান ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি একা একটি বাঘ মারিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল বাঘা যতীন। এই বীর বিপ্লবী অধিনায়ক হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। বিচারে বাঘা যতীন খালাস পান। ইহার পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক দলের সহিত গোপনে চুক্তিবদ্ধ হন। এদিকে বাঙালী বিপ্লবিগণ জার্মানির ন্যাশন্যাল পার্টির সহিত যোগাযোগ করিলেন। জার্মানির সহিত তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। জার্মানি ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য দুইটি জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিল। একটি সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে এবং অপরটি উড়িষ্যায় পৌঁছিবার কথা ছিল। তৃতীয় একটি জাহাজও আসিবার কথা ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা অনুসারে বালেশ্বরে রেল-লাইন অধিকার করিয়া ইংরেজদের যাতায়াতের পথ অবরোধ করা ছিল উদ্দেশ্য। বাঘা যতীন তাঁহার অনুচরগণ চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বরে রওয়ানা হইলেন। আর নরেন্দ্র ভট্টাচার্য নামে অপর একজন বিপ্লবী চলিলেন বাটাভিয়ায়। ব্রিটিশ সরকার গোপনে সংবাদ পাইলে জাহাজগুলি আর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিল না। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট বাঘা যতীনকে ধরিবার জন্য পুলিশ বাহিনী লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন। বালেশ্বরের এক বিপ্লবী ঘাঁটিতে হানা দিয়া টেগার্ট বাঘা যতীনের সন্ধান পান। কিন্তু বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করা সহজসাধ্য

বাঘা যতীন

ছিল না। পুলিশের নজর যখন এড়ান গেল না তখন বাঘা যতীন ও তাঁহার সঙ্গীরা বুড়ীবালাম নদীর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। সামরিক কায়দায় তাঁহারা টেগার্টের পুলিশ বাহিনীর সহিত কোপাতপোদায় খণ্ডযুদ্ধ চালাইলেন। শেষ পর্যন্ত চিত্তপ্রিয় ঘটনা স্থলে মারা গেলেন। তলপেটে গুলি লাগিলে বাঘা যতীনকে ধরা সম্ভব হইল বটে, কিন্তু হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হইল। বাঘা যতীন নামে যেমন বাঘা তেমনি কাজেও তিনি বাঘই ছিলেন। ভয়ভীতি বলিয়া তাঁহার অন্তরে কিছু ছিল না। সেই সময়ে ব্রিটিশের দোর্দণ্ড প্রতাপ। কিন্তু বাঘা যতীন ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেওয়া বীরের কাজ মনে করিলেন। কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রাণে বাঁচিবার নীচতা তাঁহার অন্তরে ছিল না। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখেও বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তিনি ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালীর মনে এক নূতন শক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনা-রচনার ক্ষমতা ও সংগঠনী শক্তি নেতা হিসাবে তাঁহার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছিল।

এম্. এন্. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রীঃ): মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। স্কুলে পড়িবার কালে সুরেন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে এক শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সেই স্কুল ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহার অন্তরে দেশসেবার এক অদম্য ইচ্ছা জাগে। বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়া তিনি বাঘা যতীনের বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া উঠেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বৈদেশিক

এম্. এন্. রায়

সাহায্য লইয়া ভারতের স্বাধীনতা আনিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিদেশী জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া না পৌঁছায় তাঁহার আশাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য মালয় হইতে জাপান, কোরিয়া, চীন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। ছদ্মবেশে নানা দেশে নানা নামে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া পুলিশের নজর এড়াইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম্. এন্. রায় নামেই তিনি পরিচিত হন। অর্থাভাব, অনাহার প্রভৃতি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য সকল হয় নাই। কিন্তু তিনি পরবর্তী জীবনেও বিপ্লবী রহিয়া গিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ভারতে ফিরিয়া আসিবার পর দেশের মাটিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাঘা যতীন ও নরেন্দ্রনাথের বিদেশী অস্ত্র লইয়া ব্রিটিশের সহিত লড়িবার আকাঙ্ক্ষা বিফল হইয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে কিছুকালের জন্য বাংলার বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকে। কিন্তু বিপ্লবীদের অনুশীলনের কাজ চলিতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। ভারতকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া দূরের কথা তাঁহাদের অত্যাচার আরও বাড়িয়া গেল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর উপর গুলি চালান হইল। এই সকল অত্যাচারে বাংলার যুব সমাজের রক্ত আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পুনরায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরিল। এইবার তাহারা বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের মূল ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আক্রমণ চালাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। তিনটি নাম এ-বিষয়ে একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নামগুলি হইল বিনয়-বাদল-দীনেশ।

বিনয়-বাদল-দীনেশ : বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। বিত্তশালী পিতার শান্ত, সুবোধ ছেলে। ঢাকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ লোম্যান ও হাড্‌সন সেই সময়ে বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাইয়া সেই

সুযোগে হিন্দু যুবকদিগকে নির্ধাতন করিতে তাঁহারা ছিলেন খুবই পারদর্শী। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছাত্রদের উপর অকথ্য অত্যাচারও তাঁহারা চালাইতেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিনয় এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে ভর্তি হইলে লোম্যান ও হাড্‌সন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বিনয় দুই জনকেই গুলি করিলেন। লোম্যানের মৃত্যু হইল। আহত হাড্‌সনের প্রাণ বাঁচিল। বিনয় পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।
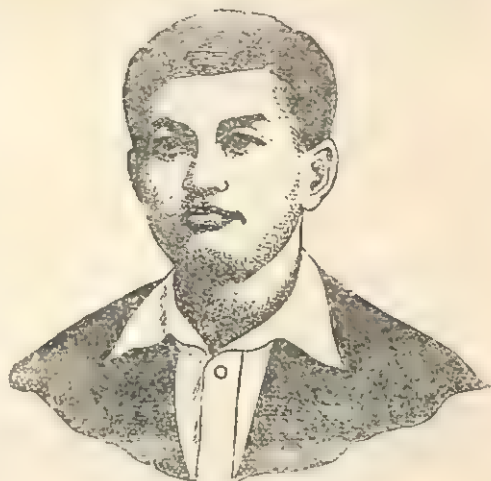
বিনয় বসু (১৯০৮-৩০ খ্রীঃ)

এইবার শুরু হইল ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের তোড়জোড়। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত তিন বীর যুবাকে ভার দেওয়া হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর দিন ধার্য হইল। পুরাদস্তুর সাহেবী পোশাক পরিয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ দুপুর বেলা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। কারাবিভাগের ইন্স্‌পেক্টর-জেনারেল সিম্প্‌সন সাহেব জেলগুলিতে বিপ্লবী যুবকদের উপর অত্যাচার করাইতেন। প্রথমেই তাঁহারা সিম্প্‌সন সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া তাঁহাকে গুলি করিলেন। সিম্প্‌সন নিজ চেয়ারেই এলাইয়া পড়িলেন। গুলির শব্দ শুনিয়া অন্যান্য সাহেব নিজ নিজ রিভল্‌ভার লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু বিনয়-বাদল-দীনেশের গুলির তোড়ের সম্মুখে তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিলেন না। নেল্‌সন সাহেব গুলিবিদ্ধ হইলেন।

খবর পাইয়া পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং পুলিশ দিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন। এদিকে মাত্র দুইটি গুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ একটি কামরায় ঢুকিয়া নিজেরাই নিজেদের জীবন শেষ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বাদল গুপ্তের নিকট আর গুলি না থাকায় তিনি বিষ খাইয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। বিনয় ও দীনেশ দুই জনেই নিজ নিজ রিভল্‌ভার হইতে নিজেদের গুলি করিলেন। সকলেরই মুখে শেষ ধ্বনি উঠিল 'বন্দেমাতরম্'। মৃতপ্রায় বিনয় ও দীনেশকে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া গেল। বিনয়কে বাঁচান সম্ভব হইল না। বিনয় তাঁহার কোন চিকিৎসাই করিতে দিলেন না। মাথার গভীর ক্ষতে আঙুল ঢুকাইয়া উহাকে বিষাক্ত করিয়া দিলেন। ক্ষত সেপ্‌টিক হইয়া গেল। এইভাবে স্বেচ্ছায় বিনয় আত্মহত্যা করিয়া ব্রিটিশ বিচারের প্রহসন এড়াইয়া গেলেন। দীনেশ ক্রমে সুস্থ হইয়া

বাদল (সুধীর) গুপ্ত (১৯১২-৩০ খ্রীঃ)

দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩০ খ্রীঃ)

উঠিলেন। বিচারে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হইল। দীনেশ অতি শান্তভাবে ফাঁসির দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জেলখানায় গীতা, রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিয়া ও গান গাহিয়া পরম আনন্দে ফাঁসির দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন দীনেশ। সেই সময়ে তিনি যে-সকল চিঠি তাঁহার মাকে এবং অপরাপর আত্মীয়ের নিকট লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মৃত্যুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়। সেই চিঠিগুলি এখনও আছে। দীনেশ শুধু বিপ্লবীই ছিলেন না তিনি ছিলেন পরম দার্শনিক। মৃত্যুকে এইভাবে গ্রহণ আর কেহ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি দেশসেবাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মাকে সান্ত্বনা দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, এক দীনেশের পরিবর্তে তিনি যেন কাঙাল, অনাথ, দুঃখীদের ভালবাসেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শত শত দীনেশকে ফিরিয়া পাইবেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ এই তিনটি নাম বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। দেশকে তাঁহারা মায়ের মত ভালবাসিয়াছিলেন। মায়ের অপমান সন্তান যেমন সহ্য করিতে পারে না সেইরূপ দেশের উপর ব্রিটিশ শাসকদের অপমান ও অত্যাচার তাঁহারা সহ্য করেন নাই। তাঁহাদের আত্মত্যাগ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশকে এক নূতন সাহস, নূতন বল দিল। ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় সেই তিনজনের ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন।

সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪ খ্রীঃ)ঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনঃ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের স্বদেশী স্কুলের শিক্ষক সূর্য সেন তাঁহার শিষ্যদের লইয়া চট্টগ্রামে রেল পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিলেন। সূর্য সেনকে তাঁহার শিষ্যরা সকলে 'মাষ্টারদা' বলিয়া ডাকিত। 'মাষ্টারদা' পুলিশ লাইন আক্রমণ করিতে গিয়া প্রহরীদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অযথা কাহারও প্রাণনাশ করা বিপ্লবাদের ধর্ম নহে। ৭২ জন প্রহরী ভয়ে পলাইয়া গেলে সার্জেণ্ট ফরেল পিস্তল লইয়া বিপ্লবীদের বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। ফরেলের স্ত্রী ও তাঁহার শিশুর গায়ে

বিপ্লবীরা এতটুকু আঁচড়ও দিল না। এখানেই ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় ও বিপ্লবীদের পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ ভারতীয় মা-বোনদের মর্যাদানাশে দ্বিধাবোধ করে নাই, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কালেও বিপ্লবীরা মিসেস ফরেলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে ভুলেন নাই।

সূর্য সেন

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রাম শহরকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সূর্য সেন হইলেন এই স্বাধীন শহরের রাষ্ট্রপতি। ব্রিটিশ শাসকরা সেইদিন ভয়ে শহর ছাড়িয়া কর্ণফুলী নদীতে একটি মোটর লঞ্চে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার পর ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে বিরাট সেনাবাহিনী আসিয়া চট্টগ্রাম শহর ঘিরিয়া ফেলিল। এইবার যুদ্ধ শুরু হইবে বুঝিতে পারিয়া বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপর প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সেনাবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া বিপ্লবীদের গুলিতে পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্ অপসরণে বাধ্য হইল। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যখন বিপ্লবীদের জয় হইল তখন অসংখ্য সৈন্য হতাহত। বিপ্লবীদের এগারজন মৃত। পরদিন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অধিকতর সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিবে ইহা নিশ্চিত ছিল। বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। পরে সূর্য সেন ধরা পড়িয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন ভট্টাচার্য প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

বিপ্লবীদের আক্রমণে তখনকার বাংলাদেশের নানা শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বিপ্লবীরা ছিলেন জীবনের বদলে জীবন, রক্তের বদলে রক্ত লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্র। ব্রিটিশদের অত্যাচারও সেজন্য

সেখানে ছিল মাত্রাহীন। জেলা শাসক জেমস্ পেডি অত্যাচারের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিমল দাশগুপ্ত নামে এক বিপ্লবী তরুণ তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। এইভাবে কানাই ভট্টাচার্য বিচারক গার্লিককে তাঁহার এজলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য লোকের মধ্যে গুলি করিয়া হত্যা করেন। দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দিবার হুকুম এই বিচারকই দিয়াছিলেন। বিমলকে অবশ্য ধরা গেল না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বিনা কারণে রাজবন্দীদের উপর হিজলী জেলে গুলি চালান হইল। দুইজন মারা গেলেন, অসংখ্য বিপ্লবী-বন্দী আহত হইলেন। ইহার প্রতিশোধ লইলেন পেডি-হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ইওরোপীয়ান এসোসিয়েশানের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে গুলি করিয়া। ভিলিয়ার্স আহত হইলেন কিন্তু প্রাণে রক্ষা পাইলেন। বিচারে বিমলের দশ বৎসর জেল হইল। সাক্ষীর অভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে পেডি হত্যার অভিযোগ টিকিল না। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লার জেলা শাসক ষ্টিভেনশনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। এবার হত্যাকারী ছিলেন শান্তি ও সুনীতি নামে দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা। বিচারে এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আবার একটি মেয়ে বীণা দাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২ খ্রীঃ) গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন। কিন্তু তাঁহার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জ্যাকসন রক্ষা পান। বীণা দাশ ধরা পড়েন। বিচারে বীণা দাশের নয় বৎসর জেল হইল। ঐ বৎসরই (১৯৩২ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগ্‌লাসকে প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। প্রদ্যুতের প্রাণদণ্ড হইল। পরবর্তী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে পর বৎসর (১৯৩৩ খ্রীঃ) অনাথ ও মৃগেন গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। অবশ্য উভয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হইলেন। এইভাবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কত তরুণকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই।

বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা সেই দিন জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশী সরকারকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বাঙালী আত্মমর্যাদাহীন জাতি নহে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিতে তাঁহারা মৃত্যুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, কলিকাতা ছিল সেই যুগের বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে মেদিনীপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরেরই সন্তান ছিলেন। তাঁহার আত্মাহুতিতে মেদিনীপুরের যে বিপ্লবী ইতিহাস শুরু হইয়াছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট বিপ্লবে তাহার সমাপ্তি ঘটে। ঐ বৎসর মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। এই সংগ্রামের আদর্শ হইল হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (do or die)। আগস্ট মাসের ৯ তারিখে এই শেষ সংগ্রামের ডাক মহাত্মা গান্ধী দিলেন। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুতই ছিলেন। ভারতের নেতৃস্থানীয় সকলকে বন্দী করা হইল। কিন্তু নেতাহীন ভারতবাসী এক বিরাট বিপ্লব শুরু করিল।

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২ খ্রীঃ): এই বীরাঙ্গনা মহিলা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানা ও দেওয়ানী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার গ্রেপ্তার হইয়া কয়েক মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনাপুরের স্থানীয় নেতাগণ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রমণ করা স্থির করিলেন। রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পুলগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশ পুলিশ বা মিলিটারীকে বাধা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। তারপর সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ শুরু হইল।

বিপ্লবীদের এক বিরাট বাহিনী তমলুক থানা ও আদালত দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইল। শহরের প্রবেশ মুখে সৈন্যরা তাহাদের বাধা দিল। কিন্তু বিপ্লবীরা তখন উন্মত্ত। জাতীয় পতাকা হাতে

লইয়া তাহারা আগাইয়া চলিতে গেলে তাহাদের উপর গুলি করা হইল। একজন গুলির আঘাতে পড়িয়া গেলে অপর একজন তাহার স্থান দখল করে।

এদিকে ৭৩ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা অপর এক বিপ্লবী বাহিনী লইয়া অন্য দিক দিয়া শহরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া মাতঙ্গিনী হাজরা সকলের পুরোভাগে আগাইয়া চলিলেন। বন্দুকের গুলি প্রথমে তাঁহার কান ও মাথা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। তবুও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পরে তাঁহার হাতে গুলি লাগিল। পতাকাটি অন্য হাতে লইয়া তিনি তবুও আগাইয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক গুলির আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরা তেমনি আগাইয়া চলিয়াছেন। এই বীরাঙ্গনাকে রুখিবার শেষ উপায় হিসাবে তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ করা হইল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া মাতঙ্গিনী হাজরা পতাকা হাতে মাটিতে শয্যা লইলেন। তাঁহার প্রাণদান বাংলা এমনকি সারা ভারতের আগস্ট আন্দোলনকে এক নূতন শক্তি দিয়াছিল। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—মহাত্মা গান্ধীর এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট, বিশেষভাবে বাঙালীর অন্তরে অমর হইয়া আছেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭- খ্রীঃ): বাংলার বিপ্লবীদের সেরা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী কাজে যোগদান না করিলেও বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না।

কংগ্রেসের অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী নেতা সুভাষের রক্তে কিন্তু বিপ্লবের নেশা ছিল। ইহার পরিচয় আমরা পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তাঁহার আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হইতেই সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের শত্রুপক্ষ জার্মানির সহিত যোগ দিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ভারতের ভিতর হইতে ব্রিটিশের উপর আঘাত হানিবার মত সামরিক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাই সুভাষ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। এদিকে কলিকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ার হইতে হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ সরাইবার আন্দোলন শুরু করিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র ধরা পড়িলেন। হলওয়েল সাহেবই ছিলেন অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনীর স্রষ্টিকর্তা। সুভাষকে জেলে আটক করা হইল। সুভাষ জেলে আটক অবস্থায়ই কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তারপর বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে তিনি অনশন শুরু করেন। দেশের সর্বত্র তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য রীতিমত আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু পুলিশ প্রহরায় তাঁহাকে নিজ বাড়ীতেই রাখা হইল। সেখান হইতে তিনি ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া বিদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে সর্ব রকমের সাহায্য করিলেন বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্স নামক সংগঠনের নেতারা। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেই গঠিত হইয়াছিল। জার্মানি ও জাপানের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিলেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ্ হিন্দ্—অর্থাৎ

সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশে বিদেশযাত্রা

স্বাধীন ভারত সরকারের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল। তাঁহার এই সেনাবাহিনী ও সরকার গঠনে জাপান ও জার্মানির হস্তে বন্দী হিন্দু-মুসলমান সৈনিক সকলেই যোগদান করিল। সিঙ্গাপুর, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রবাসী ভারতীয় স্ত্রীলোক, পুরুষ অনেকেই আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করিলেন। যথাসর্বস্ব দিয়া তাঁহারা আজাদ্ হিন্দ্ সরকারকে সাহায্য করিলেন। ঝাঁসি বাহিনী নামে এক স্ত্রী-সেনাবাহিনীও গড়িয়া উঠিল। তারপর শুরু হইল ভারত আক্রমণ। ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নই ছিল এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হইলেন আজন্ম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। তাঁহার উপাধি হইল নেতাজী সুভাষ।

তারপর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ আসামের কোহিমা, বিষেণপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করিল। কিন্তু জয়ের কালে খাদ্যাভাব হেতু নেতাজী তাঁহার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ্ অপসরণের আদেশ দিলেন। অবশেষে জাপানের পরাজয় নিশ্চিত হইয়া উঠিল। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী সুভাষের আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের আত্মত্যাগ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এইভাবে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে বিপ্লবী কাজ শুরু হইয়াছিল তাহা নেতাজী সুভাষের আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের ব্রিটিশ শক্তির উপর আঘাতে সমাপ্তি ঘটিল। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতকে আর দখলে রাখা যাইবে না।

পরিচ্ছেদ—৭

বাংলার পুনরুজ্জীবন (Regeneration of Bengal)

বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবা। উনবিংশ শতকের প্রথম দিক হইতে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বহু মনীষী ও জননেতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত শতাধিক বৎসরে বাংলার ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই এক পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। এই দীর্ঘকালের প্রথম অংশের আলোচনা চতুর্থ পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। অপরাপর যে-সকল মনীষীর অবদানে বাংলার ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির ভাণ্ডার পুষ্ট হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) : এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী জাতি নিজস্ব সবকিছু ভুলিতে বসিয়াছিল। শিক্ষিত বাঙালীরা পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম পর্যন্ত সবকিছু অনুকরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি বাহির হইতে ঘরের দিকে ফিরাইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে বাঙালীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। শুরু হইয়াছিল এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন।
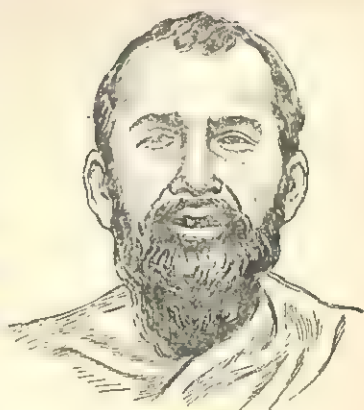
শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দের আদি নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সন্ন্যাসী জীবনে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। বাল্যকালে মাতা

ভুবনেশ্বরীর নিকট হইতে সত্য পথে চলা, পবিত্র জীবন যাপন ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখার শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন। মানুষের প্রকৃত মূল্য হইল তাহার মনুষ্যত্ব। এই সত্য পিতা বিশ্বনাথ দত্তের নিকট তিনি জানিয়াছিলেন। জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউশানে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বি. এ. পড়িবার সময় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ঈশ্বর প্রকৃতই আছেন কিনা এ-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জাগে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে লাগিলেন। বড় বড় ধর্ম-জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের সংশয় দূর হইল না। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। প্রকৃত সাধকের কাছে ঈশ্বর ধরা দেন একথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট জীবকে শিবরূপে সেবা করিবার ধর্ম তিনি শিখিলেন। তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতের মূল আদর্শ এবং হিন্দু ধর্মের মূল সত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। দীর্ঘকালের অবহেলায় ভারতীয়রাই এই আদর্শ ও সত্য ভুলিয়া গিয়াছিল। বিবেকানন্দ এই আদর্শ সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ধনী, দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের আদর্শ ই যে ভারতের মূল আদর্শ ইহা বিবেকানন্দ সকলের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেশবাসীর দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা তিনি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দুর্দশা হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বার্থ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তিনি যুব সমাজকে আহ্বান

করিয়াছিলেন। জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বা ধ্যান করিয়া মুক্তি তিনি চাহেন নাই। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বিবেকানন্দ অন্তরের দুর্বলতাকেই পাপ বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তিনি দেশের যুবকদের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া সেবার কাজে আগাইয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরম জননী মাতৃভূমি ছিল বিবেকানন্দের জগজ্জননী। ইহার আরাধনার জন্য তিনি দেশের যুব সমাজকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভারতে মানুষ তৈয়ার করিবার মন্ত্রই তিনি শিখাইয়াছিলেন। নিজের উপর বিশ্বাস রাখা, সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ, স্বার্থ ত্যাগ ও জীবের সেবা প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম, একথা বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন। পরাধীনতাকে স্বামী বিবেকানন্দ এক অভিশাপ বলিয়া মনে করিতেন। দেশের মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। এজন্য চাই নিজ শক্তিতে বিশ্বাস। ভিক্ষাপাত্র লইয়া ব্রিটিশের কাছে প্রার্থী হওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। এজন্য জাতি গঠনের কাজ ছিল তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম, পুণ্য ব্রত।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিনা নিমন্ত্রণে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি সামান্য কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিবার সুযোগ পান। কিন্তু তিনি যখন প্রথমেই আমেরিকা-বাসীকে 'ভগিনী ও ভ্রাতাগণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন সকলে তাঁহার আন্তরিকতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাঁহার বক্তৃতা দিবার সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি হিন্দু ধর্মের মূল সত্য সম্পর্কে সমবেত বিদেশীদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন। সকল ধর্মই যে একই লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ একথা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় তাহা তিনি বলিলেন। এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধের কোন প্রশ্নই নাই। আমেরিকাবাসী তাঁহার এই সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের কথায় তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাইল।

অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ইংলণ্ড এবং ইওরোপের অপরাপর দেশ হইতে তাঁহার কাছে আমন্ত্রণ আসিল। তিনি এই সকল পাশ্চাত্য দেশে বক্তৃতা দিয়া বিশ্ববিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিলেন। ভারতের মূল আদর্শ পাশ্চাত্য দেশে প্রসার লাভ করিল। ইংলণ্ডে যখন স্বামী বিবেকানন্দ গিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল-এর সাক্ষাৎ হয়। ইনিই পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ বহির্মুখী দেশবাসীর দৃষ্টি নিজেদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্যের দিকে ফিরাইয়া দিয়া ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

(খ) ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১ খ্রীঃ): নিবেদিতা একটি সার্থক নাম। তাঁহার আদি নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। নোব্‌ল পরিবার তাঁহাদের আদি দেশ আয়র্লণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া আসিয়াছিলেন। মার্গারেট ইংলণ্ডে লেখাপড়া শেষ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ধর্মের ব্যাপারে তাঁহার মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে আসিলে মার্গারেট তাঁহার সান্নিধ্যে আসেন। স্বামীজীর সহজ ও সরল ব্যাখ্যা মার্গারেটকে হিন্দু ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মার্গারেটকে বিস্ময়াভিভূত করে। মার্গারেটের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বুঝিতেও বিবেকানন্দের বিলম্ব হইল না। শেষ পর্যন্ত মার্গারেট ভারতে চলিয়া আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসিনী হিসাবে তিনি নিবেদিতা নামে পরিচিত হন। তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সেবায় নিজেকে

ভগিনী নিবেদিতা

সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি 'নিবেদিতা' নামকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

যে কয়েকজন বিদেশীয় ভারতকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভারতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক একথা মনেপ্রাণে চাহিয়াছিলেন। এজন্য প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পর তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। নিবেদিতা ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সর্বত্র, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলা। সেই সময়ে বাঙালীদের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহার পশ্চাতে ভগিনী নিবেদিতার দান নেহাত কম ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও নিবেদিতার দান ছিল যথেষ্ট। ভারতীয় নারীদের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলিকে উৎসাহ দান এবং সমর্থন নিবেদিতা করিতেন। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষের মত নিবেদিতা ছিলেন চরমপন্থী। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশী এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেস যাহাতে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন গ্রহণ করে সেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি, সেই সময়কার মনীষী মাত্রেই নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নিবেদিতার উৎসাহের শেষ ছিল না।

ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা সাধারণ দেশপ্রেম অপেক্ষা অনেক গভীর ছিল। ভারতের মুক্তি সাধনায় নিবেদিতার আত্মত্যাগ তুলনাহীন। ভারতকে তিনি স্বদেশে পরিণত

করিয়াছিলেন। স্বদেশের সেবা ও ধর্ম সাধনা তাঁহার কাছে ছিল অবিচ্ছেদ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনে নিবেদিতা সর্বাপেক্ষা সর্বাধিক আনন্দ পাইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই তিনি স্বাধীনভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছিলেন উহাই ছিল সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নিবেদিতা স্কুল নামে পরিচিত।

এক আকস্মিক অসুস্থতায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিং শহরে তাঁহার মরদেহ ত্যাগ করেন।

(গ) (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ): স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাঙালী জাতিকে এবং ভারতবাসীকে জাগাইয়া তুলিবার গানই গাহিয়াছেন। তিনি দেশের নদনদী, পাহাড়, কন্দর এককথায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার ভালবাসাকে দেশের প্রতি ভালবাসার সহিত অবিচ্ছেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভয়, কাপুরুষতা, আত্মমর্যাদাহীনতা প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া ভারতবাসীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অন্যায় করা আর অন্যায় সহা দুই-ই তাঁহার কাছে ঘৃণ্য ছিল। দেশকে যে প্রকৃত ভালবাসিতে পারে তাহার কাছে দেশের জন্য মৃত্যুর ডাক সঙ্গীতের মত শুনাইবে, এই ছিল তাঁহার কথা।

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক—সকল প্রকার উন্নতি দেশের হিন্দু-মুসলমান এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসার উপর নির্ভর করে, এই শিক্ষা তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা, গান, তাঁহার প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রভৃতির অনেকগুলিই দেশের সমস্যা ও উহার সমাধান লইয়া রচিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শুরু করিয়া অসংখ্য গানের মধ্য দিয়া তিনি জাতীয়তার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নতি, সাধারণ লোকের উন্নতি, জাতিভেদের অবসান, কুসংস্কার হইতে মুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমেই ভারতের পুনরুজ্জীবন

সম্ভব এই কথা বলিয়াছিলেন। ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বাড়াইবার উপায় হিসাবে কৃষি ও শিল্প মেলার আয়োজন মাঝে মাঝে করা ছিল তাঁহার মত। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা সহজেই ফলবতী হইবে এই ছিল তাঁহার দৃঢ় ধারণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলা ভাষা পড়ান হইত না, সেই সময়ে বাংলা ভাষা পড়াইবার কথা তিনিই বলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেওয়া 'স্যার্' অর্থাৎ 'নাইট্' (Knight) উপাধি ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার নির্ভীকতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও গভীর দেশপ্রেম দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচিত গান ভারতের পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রস্বরূপ ছিল। তাঁহার রচিত 'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। ভারতের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম।

(২) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রীঃ) ঃ বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান ছিল খুব বেশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয়তাবাদের দুর্গে যাঁহারা পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বি.এ. পরীক্ষায় এবং গণিত শাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান আশুতোষ অধিকার করিয়াছিলেন। আইন পাশ করিবার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। পরে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। অল্পকালের জন্য তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। একাদিক্রমে আশুতোষ

চারিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আশুতোষের নির্ভীকতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার মত পুরাপুরি বাঙালী একমাত্র বিদ্যাসাগর ভিন্ন অপর কেহ ছিলেন না। যে সময়ে সরকারী কর্মচারীদের সাহেবিয়ানা একরকম বাধ্যতামূলক ছিল সেই সময়ে আশুতোষ সাধারণ ধুতি-চাদর পরিয়া বিখ্যাত স্যাড্লার কমিশনের সদস্য হিসাবে ভারতের সর্বত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বাঙালী পোশাক, বাঙালী জাতি, বাংলা ভাষা ছিল তাঁহার গর্বের জিনিস। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হিসাবে তিনি যে স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙালীর অন্তরে সাহস ও শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছিল।

স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ যেমন বিরাট পরিকল্পনা করিতেন তেমনি উহা কার্যেও রূপান্তরিত করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত তিনিই করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত এবং আরও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। আশুতোষ সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার স্নাতকোত্তর বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ প্রভৃতিতে তিনি ভারতের বিভিন্নাংশ হইতে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তিদের লইয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. ভি. রমণ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণকে

আশুতোষই আনিয়াছিলেন। সি. ভি. রমণ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বাড়াইয়াছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু মনীষী আশুতোষের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন।

এইভাবে বাঙালী মনীষী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। আশুতোষের জীবনের ধ্যান ছিল জননী বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করা। শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করিয়া আচারে, আচরণে, কথাবার্তায় প্রকৃত বাঙালী হইবে ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম্. এ. পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আশুতোষ সেই কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষ ছিলেন তেজস্বী দেশপ্রেমিক। বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করিয়াউহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিতে চাহিলে আশুতোষের ক্রোধ ফাটিয়া পড়িয়াছিল। জাতীয়তার দুর্গ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দমন করিবার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সেই দিন রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সরকারী অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে দাসত্ব গ্রহণ করিবেন না একথা লর্ড লিটনকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবেন তবুও স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিবেন না এই কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন 'বাংলার বাঘ' (Bengal Tiger)। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে স্বাদেশিকতা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতা-স্পৃহা আশুতোষ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে 'নাইট্' (Knight) উপাধি দিয়াছিলেন। আরও বহু উপাধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল উপাধির ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার বাঙালীত্ব। তাঁহার তেজস্বিতা, পৌরুষ, অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা এবং সর্বোপরি তাঁহার দেশাত্মবোধ বাঙালী জাতির জীবন পথের পাথেয়।

(৩) জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮–১৯৩৭ খ্রীঃ): বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পুনরুজ্জীবন ঘটিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক লইয়া মৌলিক গবেষণায় বাঙালী পশ্চাৎপদ রহিল না। বিজ্ঞানী স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ

সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

জাতি যখন জাগিয়া উঠে তখন এই জাগরণের কোন গণ্ডি থাকে না। সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই জাগরণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার জাগরণ স্বভাবতই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও বাদ দেয় নাই। সবকিছুকে নূতন করিয়া বিচার করা, সবকিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইল জাগরণের বা নবজাগরণের ধর্ম। বাংলাদেশের জাগরণের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান বাদ গেল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানে গবেষণা করিয়া লণ্ডনের ডি. এস্. সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করেন। সেই সময়ে এবং পরবর্তীকালে তিনি উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া উদ্ভিদের সহিত প্রাণীদেহের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার এই আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজকাল ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র তৈয়ার করিয়া মানুষের মস্তিষ্কের কাজকর্ম এই যন্ত্র দ্বারা করান হইতেছে। জগদীশচন্দ্র বসু মানুষের স্মৃতিশক্তির একটি যান্ত্রিক নমুনা তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রের উহা একটি প্রাথমিক রূপ ছিল বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করিয়া জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং বাঙালী জাতিকে গৌরবের আসনে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

(৪) **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪ খ্রীঃ) :** বাঙালীদের নবজাগরণের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে (Chemistry) মৌলিক গবেষণার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি. এস্. সি. ডিগ্রী পান। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক হন।

আজীবন ব্রহ্মচারী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বিজ্ঞান সাধনা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটান। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু কৃতী ছাত্র তাঁহার অধীনে নানা প্রকার মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিবার চেষ্টা শুরু হইয়াছিল সেই সময়ে প্রফুল্ল-চন্দ্র ভারতের সর্বপ্রথম রসায়ন দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' নামে পরিচিত। দেশীয় শিল্প, দেশীয় সবকিছু গড়িয়া তুলিয়া বাঙালী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টার শেষ ছিল না। জাতীয় শিক্ষার প্রসার, যুব সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তোলা, সমাজের সবরকম কুসংস্কার দূর করা প্রভৃতির জন্য প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী যুবকদিগকে তিনি আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা ও দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। ছোট বড় বলিয়া তাঁহার কাছে কোন প্রভেদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছিল না। দরিদ্র ছাত্ররা তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হইত না। তিনি তাঁহার জীবনের সঞ্চয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষা প্রসারের জন্য দান করিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাঙালী যুব সমাজকে দেশসেবা, শিল্প স্থাপন, ব্যবসায়ে যোগদান প্রভৃতিতে উৎসাহিত করিয়া এক নবচেতনা তিনি আনিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালীর জাগরণের ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বাঙালী জাতি তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধি দিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে।

(৫) অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রীঃ)ঃ বাঙালীর জাতীয় জাগরণে বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের জাগরণে অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। সত্যবাদিতা, চরিত্রবল, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণ সেই যুগের ছাত্রদের মধ্যে জাগাইয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক। অল্পকালের জন্য তিনি ওকালতিও করিয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতি পেশায় সব সময় সত্য কথা বলা চলে না এজন্য তিনি পুনরায় শিক্ষকতায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে তিনি স্বাস্থ্য গঠন, সত্য কথা বলা, দেশকে ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বরিশাল শহরের ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি সমাজসেবার এক গভীর উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দরিদ্রের সেবা, রোগীর সেবা প্রভৃতি কাজের জন্য তিনি ছাত্রদের একটি সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশপ্রেম

অশ্বিনীকুমার দত্ত

জাগাইবার উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রাগানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুকুন্দ দাশ তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যাত্রাগানের মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গের সর্বত্র দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। অশ্বিনী দত্ত নিজেও বহু দেশাত্মবোধক গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবা, সমাজ সেবা তাঁহাকে বরিশালের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সকলের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। যুব সমাজের মধ্যে এক বলিষ্ঠ চরিত্রবল, সামাজিক উদারতা ও দেশাত্মবোধ তিনি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

(৬) সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭): বাঙালী বীর, দেশমাতার একনিষ্ঠ সাধক, আত্মত্যাগী সুভাষচন্দ্র বাঙালী জাতিকে দেশাত্মবোধে দীক্ষা দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সুভাষচন্দ্র দেশকে মাতার আসনে বসাইয়াছিলেন। দেশ বা দেশবাসীর অপমান তিনি কোনদিন সহ্য করেন নাই। এজন্য তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভারত-বিদ্বেষী অধ্যাপক ওটেনের উপর হাত তুলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন আত্মত্যাগী বীর পুরুষ। সাহস, বীরত্ব, দেশ-প্রেমের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। যে যুগে আই. সি. এস্. চাকরি পাওয়া ভারতীয় যুবকদের ছিল জীবনের চরম সার্থকতা, সেই চাকরি পাইয়াও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদেশী সরকারের চাকরি করিয়া অর্থ, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান অপেক্ষা দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন তাঁহার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হইলেন। যে দায়িত্ব তাঁহার উপর দেওয়া হইত তাহা তিনি পালনে দেহপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসন যখন কংগ্রেসের অনেকেরই আদর্শ ছিল তখন তিনি পূর্ণ

সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমে সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন আজীবন বিপ্লবী। ব্রিটিশ সরকার এই দেশপ্রেমিককে রীতিমত ভয় করিতেন। এজন্য তাঁহাকে বহুবার বিনা-বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সুভাষচন্দ্র দমিবার পাত্র ছিলেন না। যখনই ছাড়া পাইতেন তখনই তিনি দেশের যুব ও ছাত্র সমাজকে স্বাধীনতা লাভের মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইতেন। তিনি জানিতেন আত্মাহুতি না দিতে পারিলে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিব।' সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আত্মত্যাগ, দেশসেবাব্রত তাঁহাকে বাঙালীর আরাধ্য পুরুষে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বাংলা এবং সমগ্র ভারতের যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের গণ্যমান্য নেতাদের সমর্থন পাইয়াও পট্টভি সীতারামিয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনটাই যেন একটি বিপ্লব। তাঁহার নেতৃত্বে বিশেষভাবে বাঙালী জাতি দেশপ্রেমের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশী সাহায্য লইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। [পরিচ্ছেদ—৬ দ্রষ্টব্য]

(৭) কাজী নজরুল ইস্‌লাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রীঃ) : বাংলার জাগরণে কবি নজরুল ইস্‌লামের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁহার কাব্য সাধনা দেশসেবার মহান্ আদর্শে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল একথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জাতিভেদ প্রথা, হীনমন্যতা, দুর্বলতা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সেজন্য তাঁহার কবিতায়

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রভৃতির উপর জোর দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন যে সুকঠিন সেই কথাও তিনি তাঁহার কবিতায় উল্লেখ করিয়া বাঙালী তথা ভারতবাসীকে সাহস সঞ্চয় করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গান ভারতীয়দিগকে বীরত্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার যখন দেশের নেতা ও দেশসেবীদের শৃঙ্খলিত করিতেছিলেন তখন তিনি গাহিয়াছিলেন 'শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল, শিকল পরে শিকল তোদের করব রে বিকল।' তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তিনি আশাবাদীও ছিলেন। বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইলে রক্তপাত নিশ্চিত, কিন্তু এই রক্তপাতের মাধ্যমেই স্বাধীনতার সূর্য উদিত হইবে, এই আশ্বাসবাণী তিনি শুনাইয়াছিলেন। বাংলার জাগরণে তাঁহার কাব্যসাধনার প্রভাব ছিল অপরিসীম।
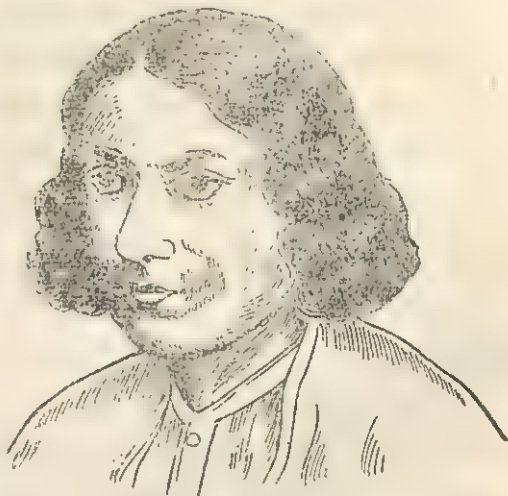
কাজী নজরুল ইস্‌লাম

(৮) এ. কে. ফজলুল হক্ (১৮৭৩-১৯৬২ খ্রীঃ) : 'শের-ই-বঙ্গাল' অর্থাৎ বাংলার বাঘ ফজলুল হক দেহ এবং মনের দিক দিয়া বাঘই ছিলেন বটে। এক শক্তিশালী কাবুলী যুবক অনেককে পাঞ্জায় পরাজিত করিয়া যখন ফজলুল হকের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তখন তিনিই তাঁহাকে 'শের-ই-বঙ্গাল' নাম দিয়াছিলেন। গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা—এই তিন বিষয়ে অনার্স (Honours) সহ বি.এ. পাশ করিয়া তিনি গণিতে এম্. এ. পাশ করেন। অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু

করিয়া তিনি অল্প কালের মধ্যেই পেশা পরিবর্তন করেন। স্যার্ আশুতোষের শিক্ষানবীশ সহকারী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু কিছুকাল পর তিনি ওকালতি ছাড়িয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। অশ্বিনী দত্ত তাঁহাকে ইংরেজদের গোলামি ত্যাগ করিতে বলিলে এক বাক্যে তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। ফজলুল হক্ ছিলেন উদারচেতা ও সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার দান-দক্ষিণা এত বেশী ছিল যে অনেক সময় তাঁহাকে উচ্চ হারে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। ঋণ করিয়াও তিনি পরের বিপদে সাহায্য করিতেন। এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করিতেন না। তিনি পরে অবশ্য কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করিয়াছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলও তিনি গঠন করিয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ বিভাগ তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে তিনি দুই বাংলার ঐক্যের কথা ভাবিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীন মতবাদের এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী মাত্রেরই একতায় বিশ্বাসের জন্য জেলে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক বল, উদারতা ও বাঙালী প্রীতি তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। স্বাধীন বাংলা-দেশের শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য।

এ. কে. ফজলুল হক্

(৯) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২ খ্রীঃ) ঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন পুরুষ-সিংহ। তিনি আজীবন তাঁহার বলিষ্ঠ দেহে বলিষ্ঠ চিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙালীর অমর্যাদা, জাতীয় অপমান তিনি নত মস্তকে গ্রহণ করেন নাই। মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার কালে এবং সেই কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিবার কালে উপরওয়ালা সাহেবদের উদ্ধত আচরণের বিরোধিতা করিতে তিনি কোন দিন দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা, আত্ম-মর্যাদাবোধ সেই সময়কার মেডিক্যাল ছাত্রদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল লিউকিস্, সাহেব হইলেও অত্যন্ত উদারচেতা, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ দখল দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ভবিষ্যতে আরও বড় হইবার প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। কর্ণেল লিউকিসের ব্যক্তিগত প্রভাব ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে চাকরি করেন। বিলাতে গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র ও অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে সর্বশেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল সরকারী চাকরি করেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক হইয়া উঠেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে বিধানচন্দ্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। প্রথমেই তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জননেতাকে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া আইনসভার সভ্য হন। আইনসভার সভ্য, কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও মেয়র,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদের সভ্য ও উপাচার্য রূপে তিনি বাঙালীর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল নিরলস কর্তব্য পালন। তিনি যাহাতে হাত দিতেন তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার উপর মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতার গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দেশসেবার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কারাগারেও তিনি কারারুদ্ধদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িলে তিনি মুখ্য মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি মুখ্য মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। বাংলার ও বাঙালী জাতির উন্নতি সাধন, তাহাদের সেবা ছিল বিধানচন্দ্রের জীবনের ব্রত। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন কারখানা, কল্যাণী ও লবণ হ্রদ শহর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, সকল ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালীর পুনরুজ্জীবনে তাঁহার অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁহার কর্মশক্তি, বহুমুখী কার্যকলাপ, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম বাঙালীর সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করে।

পরিচ্ছেদ—৮

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ খ্রীঃ (Second Partition of Bengal, 1947)

পটভূমিকা (Background) : ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-

মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখা অসম্ভব করিয়া তুলিবে একথা তাহারা বুঝিল। এজন্য তাহারা স্বদেশী আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন রাখিবার সব রকম চেষ্টার ত্রুটি করিল না। অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য অনেকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান জনসাধারণ এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হইতেও তাহারা বিচ্ছিন্ন ছিল।

ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদ নীতি ক্রমে কার্যকর হইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ তাহারা ছড়াইতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্‌পদতা তাহাদের সুযোগ বৃদ্ধি করিল। সাম্রাজ্যবাদের মূল অস্ত্র 'বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন কায়েম' (Divide and Rule) করার নীতি তাহারা প্রয়োগ করিতে লাগিল। ফলে যে ব্রিটিশ সরকার মুসলমান রাজা ও নবাবের হাত হইতে তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল সেই ব্রিটিশের সমর্থনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করিল। ব্রিটিশ শাসকবর্গের দুরভিসন্ধি এইভাবে কার্যকর হইয়া উঠিল। ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহ্‌ 'মুসলিম লীগ' নামে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। ইহা ছিল কংগ্রেস-বিরোধী একটি প্রতিষ্ঠান। বড়লাট লর্ড মিণ্টো নিজে মুসলিম লীগ সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত আলিগড় অ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ এই কলেজটিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বাড়িতে লাগিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকার পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিল। মুসলমানগণই আইনসভা প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন এই নীতি চালু করা হইল। মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধসম্পন্ন অনেকে অবশ্য এই সঙ্কীর্ণ

সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন নাই। অনেকে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত রহিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গের বিভেদ-নীতি পূর্ণ মাত্রায় সফল হইল। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার সমর্থন পাইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মুসলিম লীগের প্রধান নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ আকস্মিক-ভাবে আবিষ্কার করিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি (১৯৪০ খ্রীঃ)। তাহারা যে ভারতীয় একথা ভুলিয়া গিয়া এই 'দুই জাতি মতবাদ' (Two-nation Theory) মুসলিম লীগ চালু করিল। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ নিজেকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিলেন। শুধু তাহাই নহে তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র দাবি করিয়া বসিলেন। প্রথমে এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একথা সকলেই মনে করিল। কিন্তু মুসলিম লীগ এই দাবির সপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে একপ্রকার উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল তাহা এখন ঘোরতর বাধার সৃষ্টি করিল। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে হিন্দু-মুসলমানদের বিভেদ আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্রিটিশ

শাসকদের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম লীগকে তাহারা অসন্তুষ্ট করিতেও রাজী হইল না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলনে ধৃত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ—মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ্, প্রভৃতি সকলকে তখন মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

জওহরলাল নেহরু

মহাত্মা গান্ধী যে কোন উপায়ে মুসলিম লীগের সহিত আপস-মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ তাঁহার পাকিস্তান দাবিতে অটল রহিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন হইল। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নিকট মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অধিকাংশ সদস্যপদেও মুসলমান কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হইলেন। বাংলাদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই ভারতবাসীর প্রকৃত মুখপাত্র।

মহাত্মা গান্ধী

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পাঠাইল। ইহা 'ক্যাবিনেট মিশন' (Cabinet Mission) নামে পরিচিত। এই মিশন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা

করিয়া 'পাকিস্তান দাবি' অগ্রাহ্য করিল (মে ১৬, ১৯৪৬ খ্রীঃ)। মুসলিম লীগ ইহার উত্তরে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নামে কলিকাতা মহানগরীতে এক বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইল। চারি দিনে প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারাইল। এই দাঙ্গার সূত্র ধরিয়া নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার শুরু হইল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ এবং পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পৃথক না করিয়া গত্যন্তর ছিল না। সেই সময়কার বাঙালী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদে স্বেচ্ছায় রাজী হইলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় হইয়া আসিলেন। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্যই তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 'পাকিস্তান' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করিলেন। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দাগণ ইচ্ছা করিলে পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে। আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট দ্বারা শ্রীহট্ট পাকিস্তানে যোগদান করিবে কিনা স্থির হইবে, এই ব্যবস্থা করা হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেও গণভোটের দ্বারা সেই প্রদেশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের ব্যবস্থা হইল। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের কোন্ কোন্ অংশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য দুইটি সীমা নির্ধারণ কমিশন নিয়োগ করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ পাকিস্তানে যোগদান করিল। এইভাবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতবর্ষের শাসন ত্যাগ করিল তখন ভারত ও পাকিস্তান দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ এইভাবে ফল দান করিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্যকে এইভাবে সেই দিন শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারও বিভক্ত করিতে পারে নাই। বাঙালী জাতি সেই সময়ে যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তাহাতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সরকার রদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ
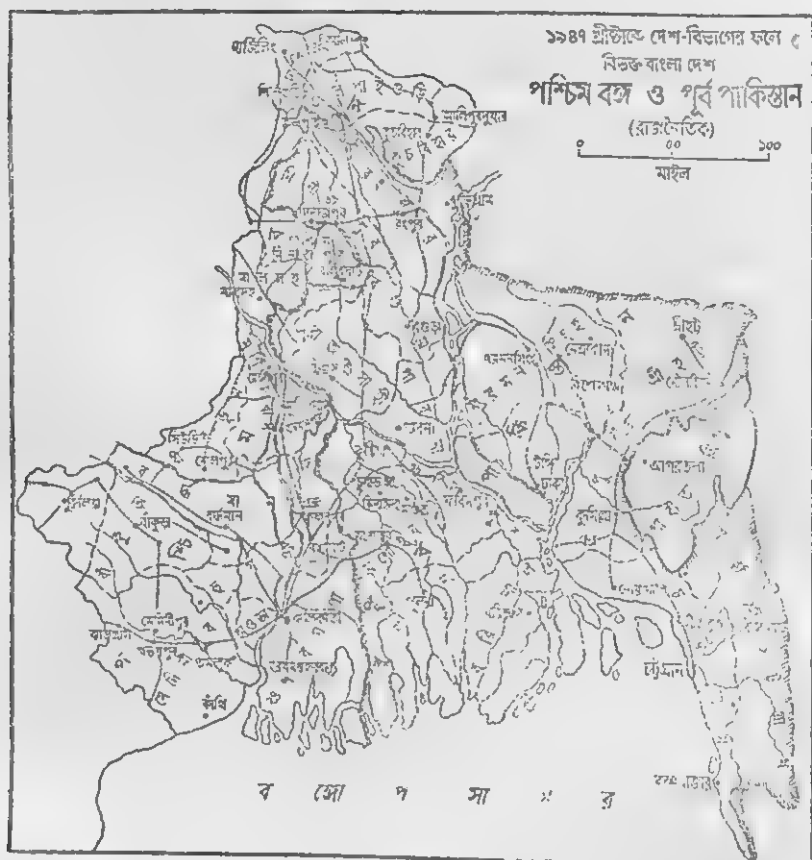
করা হইল সেই দিন কোন আন্দোলন দূরের কথা বাঙালী উহা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক বিষক্রিয়ার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ-নীতি হিন্দু-মুসলমানদের যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সর্বনাশাত্মক কুফল এই দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গে দেখা দিয়াছিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুযায়ী স্যার সাইরিল রেড্‌ক্লিফের সভাপতিত্বে সীমা নির্দেশের জন্য দুইটি কমিশন গঠন করা হইয়াছিল—একটি বাংলাদেশের জন্য অপরটি পাঞ্জাবের জন্য।

বাংলাদেশের সীমা নির্দেশের কমিশন বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিল। এই দুই ভাগের একটি হইল পশ্চিমবঙ্গ অপরটি পূর্ব-পাকিস্তান। পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তর ও পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পূর্বে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও উত্তর-পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য। পূর্ব-পাকিস্তান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী এই তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত। দিনাজপুর (পূর্ব), রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা, বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এইভাবে ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতিগত ঐক্য বিনাশ করিয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ অনুষ্ঠিত হইল।

পরিচ্ছেদ—৯

বাংলাদেশের অভ্যুত্থান, ১৯৭০-৭১ খ্রীঃ (Rise of Bangladesh, 1970-71)

পটভূমিকা (Background) ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট অখণ্ড ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন দেশের জন্ম হইল। পাকিস্তান গঠিত হইল দুইটি পৃথক অংশ লইয়া। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পশ্চিম-পাঞ্জাব লইয়া পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ, আর পূর্ববঙ্গ হইল পূর্ব-পাকিস্তান। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দুই অংশের মধ্যে আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি কোন দিক দিয়াই কোন মিল ছিল না। একমাত্র ধর্মের সূত্র দিয়া এই দুই অংশকে বাঁধিয়া রাখা

সম্ভব হইবে না একথা পাকিস্তানের নেতাগণ প্রথমেই বুঝিতে পারিলেন। ইহা ভিন্ন পাকিস্তানের মোট বার কোটি অধিবাসীর সাড়ে সাত কোটিই পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী। এই কারণে প্রথম হইতেই পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রাধান্য যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানে কায়েম হয় সেই চেষ্টা শুরু হইল। পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিকদের অধিকার উপেক্ষা করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানী কর্মচারীদের পূর্ব-পাকিস্তানের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইল। বাঙালীদের সংস্কৃতিকে বিনাশ করাও প্রয়োজন ছিল। এজন্য প্রথমেই উর্দু ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের ভাষা বাংলা। এই ভাষাকে সরকারী ভাষার অন্যতম হিসাবে গ্রহণের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা দাবি জানাইলে উহা অগ্রাহ্য করা হইল। নির্বাচনের মাধ্যমে কোন সরকার গঠন করা হইলে পূর্ব-পাকিস্তানই সমগ্র পাকিস্তানের উপর শাসন-ক্ষমতা পাইবে. এজন্য কোন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দিকেও পাকিস্তানের নেতারা মনোযোগী হইলেন না। পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসাবেই রাখিবার চেষ্টা চলিল।

(১) শেখ্ মুজিবর রহ্মান: পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া শেখ্ মুজিবর রহ্মানের জন্মস্থান। কলিকাতা ইস্লামিয়া কলেজ (বর্তমান মৌলানা আজাদ্ কলেজ) হইতে তিনি বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি নেতা ফজলুল হক্ ও শহীদ সুরাবর্দীর প্রভাবে প্রভাবিত হন। ছাত্রাবস্থায়রাজনীতিতাঁহার নেশা হইয়া দাঁড়ায়। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির পশ্চাতে তাঁহার

শেখ্ মুজিবর রহমান

সমর্থন ছিল। কিন্তু পাকিস্তান যখন সত্যই হইল তখন তিনি

দেখিলেন পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাশের ছাত্র। স্বাধীন পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁহার সকল ধারণা ধূলিসাৎ হইল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জিন্নাহ্ একমাত্র উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পাকিস্তানের অধিবাসীদের অধিকাংশের ভাষা বাংলা। কিন্তু বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার একটি বলিয়া স্বীকার করা হইল না। মুসলিম লীগের নেতারা বাংলা ভাষার যথাযোগ্য সম্মান দিতে রাজী হইলেন না। শুরু হইল বাংলা ভাষা স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের নেতা শেখ্ মুজিবরকে পূর্বেই জেলে আটক করা হইয়াছিল। মৌলানা ভাসানি প্রভৃতি যে-সকল নেতা মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন এবং পাকিস্তান অর্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি পাল্টা রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। শেখ্ মুজিবর রহ্মান তখনও জেলে। তাঁহাকে সম্পাদকদের একজন করা হইল।

এদিকে ভাষার ব্যাপারে পূর্ব-বাংলার লোকেরা নতি স্বীকার করিল না। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রায় বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দাবি করা হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব-বাংলার ছাত্রদের সকল দল মিলিয়া একটি 'রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী এই কর্ম পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দিল। এই দিনটিকে তাহারা ভাষা দিবস রূপে পালনের ব্যবস্থা করিল। সরকার সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিলেন। কিন্তু ছাত্ররা সেই নিষেধাজ্ঞা না মানিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল। এরূপ একটি নিরস্ত্র ছাত্র দলের উপর গুলি চালান হইল। জব্বার, রফিক ও বরকত নামে তিনজন তরুণ ছাত্র প্রাণ হারাইল। ভাষা আন্দোলনে এরাই তিনজন প্রথম শহীদ। এই তিনটি প্রাণের বিনিময়ে সমগ্র পূর্ব-বাংলায় এক দারুন জাগরণের সৃষ্টি হইল। তাহাদের মৃত্যু পূর্ব-বাংলার গণ-অভ্যুত্থানের নির্দেশ দিয়া গেল।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করিল। শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক্ হইলেন মুখ্য মন্ত্রী। শেখ্ মুজিবর হইলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী। কিন্তু কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়া হক্ সাহেব দুই বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার কথা বলিলেন। দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াত, ব্যবসায়-বাণিজ্য সহজ করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। মুসলিম লীগের নেতাগণ ও কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ফজলুল হক্ ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হইল।

দুই বৎসর পর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইল। পাকিস্তানকে একটি ইস্‌লামিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইস্কান্দার মির্জা হইলেন উহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ইহার পর শুরু হইল নানা প্রকার রাজনৈতিক খেলা। তাঁহারই চালে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হইয়া গেল। মৌলানা ভাসানি ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি নাম দিয়া একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। সেই সময় হইতেই আওয়ামী লীগ ও উহার নেতা শেখ্ মুজিবর পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া লইয়া চলিলেন।

ইস্কান্দার মির্জার স্বেচ্ছাচারিতায় সর্বত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইলে তিনি পাকিস্তানে সামরিক শাসন চালু করিলেন। জেনারেল আয়ুব হইলেন তাঁহার দক্ষিণহস্ত। অল্প দিনের মধ্যেই আয়ুব খাঁ ইস্কান্দার মির্জাকে সরাইয়া দিয়া নিজে সর্বেসর্বা হইয়া বসিলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক অদ্ভুত শাসনতন্ত্র চালু করিলেন। শাসনের সকল ক্ষমতাই প্রেসিডেণ্টের হাতে রাখা হইল। বলা বাহুল্য, তিনি নিজে হইলেন সেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম প্রেসিডেণ্ট। এদিকে পূর্ব-বাংলার জনসমাজ, বিশেষভাবে ছাত্ররা প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দাবি করিল। সব কিছুকে চাপা দিবার জন্য ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আয়ুব খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পূর্ব-বাংলাকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলা ছিল

তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা করিতে পারিলে পূর্ব-বাংলায় সকল রকম আন্দোলন বন্ধ করা যাইবে। কিন্তু ভারত সরকার যুদ্ধ পশ্চিম-পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ রাখিলেন। পূর্ব-বাংলার যাহাতে কোন ক্ষতি না নয় সেই ব্যবস্থাও করিলেন। যুদ্ধে আয়ুব খাঁ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাসখন্দ চুক্তিতে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে (জানুয়ারী ১১, ১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ঐ বৎসরই শেখ্ মুজিবর তাঁহার বিখ্যাত ছয় দফা দাবি পেশ করিলেন। এই ছয় দফা দাবির মূল কথা ছিল কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র-সম্পর্ক ভিন্ন সকল বিষয়ে পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই ছয় দফা দাবি পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের মনে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করিল। আয়ুব খাঁ শেখ্ মুজিবরকে দমন করিবার জন্য মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে বার বার গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন অভিযোগই টিকিল না। অবশেষে মুজিবর রহ্‌মানকে একেবারে শেষ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার এবং আরও ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইল। তিনি নাকি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীন করিতে চাহিতেছিলেন। আগরতলা এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিল বলা হইল। এজন্য এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। কিন্তু বিচারে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইল। মুজিবরের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ এবং এই সূত্রে বিভিন্ন লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার পূর্ব-বাংলার জনগণকে ক্ষেপাইয়া তুলিল। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রভাব পূর্ব-বাংলার মানুষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এজন্য ইতিমধ্যে ঢাকা বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে পূর্ব-বাংলার জনগণের বিদ্রোহী মনে আগুন জ্বালাইয়া দিল।

অল্প কালের মধ্যেই যে আয়ুব খাঁ শেখ্ মুজিবরকে শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার নিজেরই ক্ষমতা শেষ হইয়া গেল। তাঁহার স্থলে আসিলেন আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান। ইনিও একজন

জেনারেল। এদিকে পূর্ব-বাংলা স্বাধীনতা দাবিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ইয়াহিয়া খান নূতন করিয়া সামরিক আইন জারি করিলেন। রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভায় ছাত্ররা পাকিস্তানী পতাকা পোড়াইয়া দিয়া সেই স্থলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াইল। ঐ বৎসরই ৭ই জুন এক বিশাল জনসভায় ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা শেখ্ মুজিবরের হাতে তুলিয়া দিল। মুজিবর সেই পতাকার সম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। জনমতের চাপে ইয়াহিয়া খান ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা করিলেন। 'এক মানুষ এক ভোট' নীতিতে নির্বাচন হইবে স্থির হইল।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং পূর্ব-বাংলার আইনসভার ৩০০ আসনের ২৮৮টি দখল করিল। গণতান্ত্রিক নীতিতে শেখ্ মুজিবর পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার আওয়ামী দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কথা। জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপ্‌লস পার্টি কেন্দ্রীয় পরিষদে ৮৪টি আসন পাইয়াছিল। পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিম-পাকিস্তান উপনিবেশ বলিয়াই বিবেচনা করিত। পূর্ব-বাংলার নেতারা পাকিস্তান শাসন করিবেন ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও পাঞ্জাবীদের ইহা সহ্য হইল না। এই তিন পক্ষ শেখ্ মুজিবরের নির্বাচনে বিপুল জয়কে বানচাল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করিল। মুজিবকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়া আলাপ-আলোচনার ঘোরালো পথ অনুসরণ করা হইল। এইভাবে যখন পূর্ব-বাংলার ধৈর্য শেষ হইল তখন (মার্চ ৭, ১৯৭১ খ্রীঃ) ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনতার সম্মুখে শেখ্ মুজিবর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সর্বস্তরে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিলেন। ইহার পূর্বেই বিনা কারণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের অনেককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল। শেখ্ মুজিবর সেনাবাহিনীকে

সংযত না করিলে এবং গণহত্যার তদন্ত না হইলে কোন কিছুতেই রাজী হইবেন না জানাইলেন। মুজিবরের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল। ইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব-বাংলার গভর্নর ও সামরিক অধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলে, ঢাকা হাইকোর্টের কোন বিচারপতি তাঁহাকে শপথ বাক্য পাঠ করাইতে রাজী হইলেন না। টিক্কা খান আর গভর্নর হইতে পারিলেন না। তিনি সামরিক শাসনকর্তা হিসাবেই কাজ চালাইতে লাগিলেন।
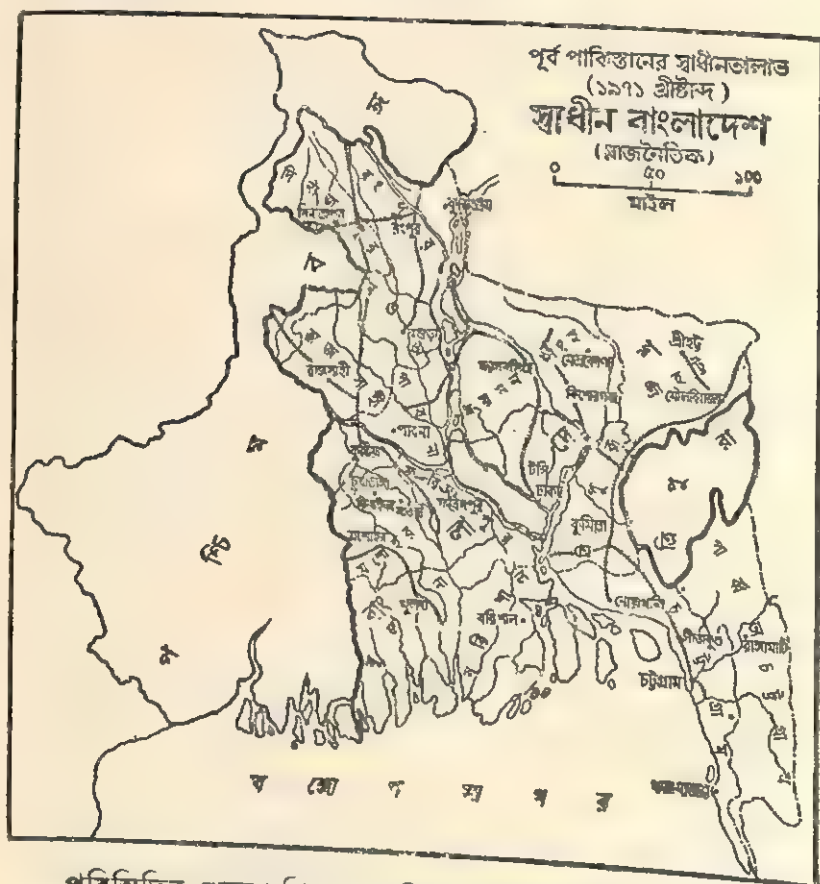
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া সময় লইবার জন্য ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সভা ডাকিলেন। কিন্তু ভুট্টো

ইহাতে বাদ সাধিলেন। তিনি সভায় যোগদানে স্বীকৃত হইলেন না। আলাপ-আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসিলেন। দফায় দফায় মুজিবের সঙ্গে আলোচনা হইল। ভুট্টো সদলবলে আসিয়া আলোচনায় যোগ দিলেন। ভিতরে ভিতরে জাহাজ-ভর্তি সৈন্য করাচী হইতে আনাইবার ব্যবস্থা হইল। বিমানে আসিল গোলা বারুদ। ২৫ তারিখের পূর্বেই ভুট্টো প্রভৃতি ঢাকা ত্যাগ করিলেন। ইয়াহিয়াও গোপনে ঢাকা হইতে পলাইয়া গেলেন। ২৫ তারিখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুজিবকে তাঁহার ধানমণ্ডির বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের এক স্থানে গোপন করিয়া রাখা হইল। বিচারের প্রহসন করিয়া তাঁহাকে হত্যার ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল।

এদিকে পূর্ব-বাংলায় এক গণ-অভ্যুত্থান শুরু হইল। এক মুক্তি ফৌজ গড়িয়া উঠিল। পূর্ব-বাংলার পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী সকলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইল। পূর্ব-বাংলার নাম হইল 'বাংলাদেশ'। পাকিস্তানী সেনা-বাহিনীর অত্যাচার, বর্বরতার সকল সীমা ছাড়াইয়া গেল। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, শিশু, বৃদ্ধ সকলের উপর অত্যাচার পূর্ব-বাংলাকে এক জীবন্ত নরকে পরিণত করিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী শুধু প্রাণ হাতে করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(২) **বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অবদান :** একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবাসীর নৈতিক সমর্থন ছিল। পৃথিবীর যে-কোন জাতির স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় সমর্থন জানানো এবং যথাসম্ভব সাহায্য করা ভারতের নীতি। বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের অবিচার-অত্যাচার স্বভাবতই ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে বাংলাদেশের প্রতি

সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিয়াছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও উহার সহায়ক রাজকার, অল্‌বদর, লীগ গুণ্ডা বাহিনীর বর্বরতা, বিশেষভাবে নারীজাতির প্রতি তাহাদের পশুর ন্যায় আচরণ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রধানের নিকট নিজে গেলেন। তাঁহাদিগকে মুজিবের মুক্তি, প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুকে ফিরাইয়া লওয়া ও গণহত্যা বন্ধ করিবার জন্য ইয়াহিয়াকে চাপ দিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ভিতরে যেমন হত্যাকাণ্ড চালাইলেন তেমনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গুলি করিতে গোপন আদেশ দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইহার ফলে যদি ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা হইলে জগতের সম্মুখে বাংলাদেশের বিপ্লবের জন্য ভারতকে দায়ী করা। কিন্তু ভারত সেই ফাঁদে পা দিল না। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান নিজেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি হইতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হইল। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই যুদ্ধ শুরু হইল। বাংলাদেশের ৬০ হাজার মুক্তিসেনার জেনারেল ওসমানী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনান্ট্‌ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন। ভারতীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে জেনারেল নিয়াজী ও টিক্কা খানের বাহিনী বাংলাদেশে কেবল পিছু হটিল। শেষ পর্যন্ত ৯০ হাজার সৈনিক সহ নিয়াজী জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রীঃ)। ১৮ই ডিসেম্বর ইয়াহিয়া পদত্যাগ করিলেন। ভুট্টো পাকিস্তানের শাসনভার লইলেন। যুদ্ধের এই কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, লেখক প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে অল্‌বদর ও রাজকার বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক পাক সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুজিবের মুক্তির জন্য আবার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের সহিত যোগাযোগ করিলেন। শেষ পর্যন্ত মুজিবের জন্য যে কবর খোঁড়া হইয়াছিল উহা সেইভাবেই রহিল। মুজিবর মুক্তি পাইলেন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত জয়ে লইয়া গিয়াছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের জনসাধারণ তাঁহার এই কঠিন কাজে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল।

জনগণ-নায়িকা শ্রীমতী গান্ধী
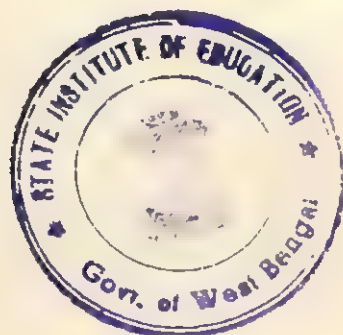
বাংলার রাজবংশ

শশাঙ্ক : ৬০৬-৬৩৭ খ্রী:

পাল বংশ (যাঁহারা সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন) :

(১) গোপাল (৭৫০-৭৭০)
|
(২) ধর্মপাল (৭৭০-৮১০)
|
(৩) দেবপাল (৮১০-৮৫০)
|
(৪) প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল)
|
(৫) নারায়ণপাল
|
(৬) রাজ্যপাল
|
(৭) দ্বিতীয় গোপাল
|
(৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

[(৪)–(৮): (৮৫০-৯৮৮)]

|
(৯) প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮)
|
(১০) নয়পাল (১০৩৮-৫৫)
|
(১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৫-৭০)

- (১২) দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫)
  - (১৮) গোবিন্দপাল
- (১৩) দ্বিতীয় শূরপাল
- (১৪) রামপাল (১০৭৫-১১২০)
  - ভীতপাল
  - রাজ্যপাল
  - (১৫) কুমারপাল
    - (১৬) তৃতীয় গোপাল
  - (১৭) মদনপাল

সেন বংশ : বীরসেন
|
সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন

[সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন: সামন্তরাজ]

|
বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮)
|
বল্লাল সেন (১১৫৮-৭৯)
|
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫*)

- মাধব সেন
- কেশব সেন
- বিশ্বরূপ সেন

---

*এই তারিখ লইয়া ঘোরতর মতানৈক্য আছে—১১৯৭, ১২০২, ১২০৭ ইত্যাদি।

ইলিয়াস্‌শাহী বংশ

শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ (১৩৪৫-৫৭)
|
প্রথম সিকন্দর শাহ্‌ (১৩৫৭-৯০)
|
গিয়াস্‌-উদ্দিন আজম শাহ্‌ (১৩৯০-৯৬)
|
সৈফ্‌-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্‌ (১৩৯৬-১৪০৬)
|
দ্বিতীয় শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ (১৪০৬-০৯)
|
শাহাব-উদ্দিন বায়াজিদ (১৪০৯-১৪)

* * *

ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ (১৪১৪)
|
যদু বা জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌ (১৪১৪-৩১)
|
শামস্‌-উদ্দিন-আহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩১-৪২)

* * *

নাসির-উদ্দিন মহমুদ শাহ্‌ (১৪৪২-৬০)
|
রুকন্‌-উদ্দিন বারবক শাহ্‌ (১৪৬০-৭৪)
|
সামস্‌-উদ্দিন ইউসুফ শাহ্‌ (১৪৭৪-৮২)
|
দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ্‌ (১৪৮২)
|
জালাল-উদ্দিন ফতে শাহ্‌ (১৪৮২-৮৬)

সুলতান শাহ্‌জাদা বারবক শাহ্‌ (১৪৮৬)

সৈফ্‌-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ (১৪৮৬-৮৯)

নাসির-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৮৯-৯০)

* * *
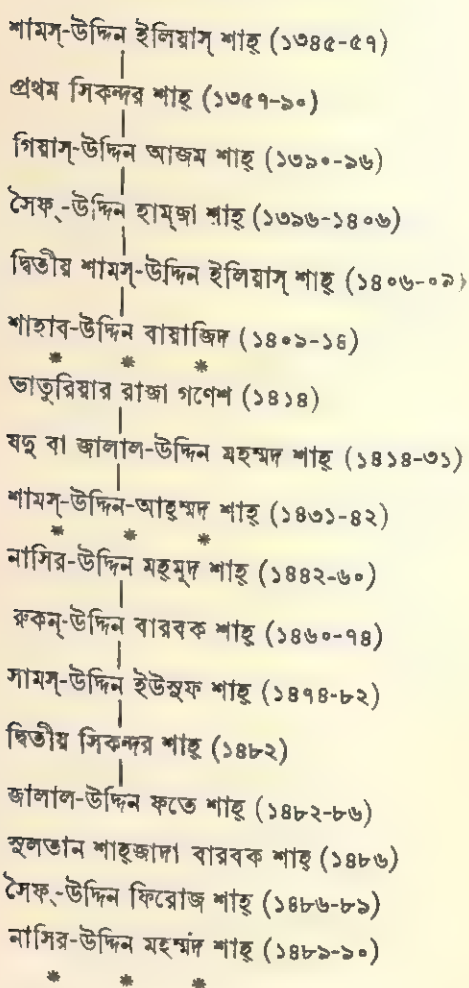
সিদি বদর : শামস্‌-উদ্দিন মজঃফর শাহ্‌ (১৪৯০-৯৩)

হুসেনশাহী বংশ

আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৮)
|
নুসরৎ শাহ্‌ (১৫১৯-৩২)
|
আলা-উদ্দিন ফিরজ শাহ্‌ (১৫৩২-৩৩)
|
গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌ (১৫৩৩-৩৮)
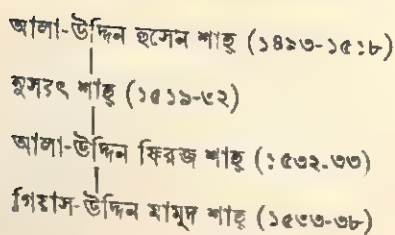
বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদকুলি জাফর খাঁ (১৭০৩-২৭)
|
কন্যা = সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯)
|
সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০)

*   *   *

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬)
|
(কন্যা আমিনা বেগম = জৈন-উদ্দিন)
|
সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬-৫৭)

*   *   *   *

মিরজাফর (১৭৫৭-৬০, ১৭৬৩-৬৫)
|
- কন্যা ফতেমা = মিরকাশিম (১৭৬০-৬৩)
- নজম্-উদ্-দৌলা (১৭৬৫-৬৬)
- সৈইফ্-উদ্-দৌলা (১৭৬৬-৭০)

সময়-রেখা

খ্রীষ্টাব্দ (A.D. = *Anno Domini* = In the year of Jesus Christ)

- —১৯৭০-৭১ পূর্ব-বাংলার 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণতি
- —দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭ খ্রীঃ
- —বিংশ শতকে বাংলার পুনরুজ্জীবন
- —১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ : স্বদেশী আন্দোলন
- —উনবিংশ শতক : বাংলার নবজাগরণ
- —পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার
- —মুর্শিদকুলি খাঁর স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা ১৭১৬
- —মোগল শাসনাধীন বাংলা : বারভূঞার বিরোধিতা
- —হুসেনশাহী বংশ ১৪৯৩-১৫৩৮
- —ইলিয়াসশাহী বংশ ১৩৪৫-১৪৮৬ (হাবসী শাসন ১৪৮৬-৯৩ খ্রীঃ)
- —সেন বংশ একাদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে ১২০৫ (১২০৭) খ্রীঃ
- —পাল বংশ ৭৫০ খ্রীঃ—দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ
- —মাৎস্য-ন্যায় (এক শতাব্দী)
- —গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রীঃ—৬৩৭ খ্রীঃ

গুপ্ত বংশ ৩২০ খ্রীঃ←

কুষাণ যুগ খ্রীষ্টীয় ২য় শতক

—খ্রীষ্টের জন্ম

মৌর্য ৩২০ খ্রীঃ পূঃ

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ৩২৬ খ্রীঃ←

বৈদিক-রামায়ণ-মহাভারত-জৈন-বৌদ্ধ যুগ : আঃ ২০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৫০০ খ্রীঃ পূঃ

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে (খ্রীঃ পূঃ) (B. C. = Before the birth of Christ)

ঘটনা-পঞ্জী

৩২৬ খ্রীঃ পূঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
৩২০ খ্রীঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা
৬০৬ খ্রীঃ শশাঙ্কের বাংলার সিংহাসন আরোহণ
৭৫০ খ্রীঃ গোপালের সিংহাসনে আরোহণ : পাল বংশের প্রতিষ্ঠা
৭৭০ খ্রীঃ ধর্মপাল কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য গঠন
৮১০খ্রীঃ দেবপালের সিংহাসন আরোহণ
১০৯৫খ্রীঃ বিজয় সেন কর্তৃক সেন বংশের প্রতিষ্ঠা
১১৯৭ খ্রীঃ (মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ) লক্ষ্মণ সেনের নদীয়া ত্যাগ : ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ারের বাংলার একাংশ দখল
১৩৪৫ খ্রীঃ শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক ইলিয়াসশাহী বংশের স্থাপন
১৪১৫ খ্রীঃ ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ কর্তৃক বাংলার সিংহাসন দখল
১৪৮৫ খ্রীঃ শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণ
১৪৮৬ খ্রীঃ বাংলায় হাব্‌সী শাসন
১৪৯৩ খ্রীঃ আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্ কর্তৃক হুসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা
১৫০৯ খ্রীঃ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার
১৫৭৬ খ্রীঃ বাংলাদেশে মোগল অধিকার স্থাপন
১৭১৬ খ্রীঃ মুর্শিদকুলি খাঁর স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা
১৭৪০খ্রীঃ ঘেরিয়ার যুদ্ধে সর্‌ফরাজ খাঁকে পরাজিত করিয়া আলিবর্দীর বাংলায় নবাবপদ গ্রহণ
১৭৫৬ খ্রীঃ আলিবর্দীর মৃত্যু
১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ-উদ্‌-দৌলার সিংহাসন আরোহণ
১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরেজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ
১৭৭০ খ্রীঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বাংলা)
১৭৭২ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম (মতান্তরে ১৭৭৪)
১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৮২৯ খ্রীঃ সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ
১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা
১৮৩৬ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
১৮৬৩ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১৯০২ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান
১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন
১৯০৮ খ্রীঃ ক্ষুদিরাম কর্তৃক কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা : বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা
১৯১১ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ রদ
১৯৪৩ খ্রীঃ নেতাজী সুভাষ কর্তৃক আজাদ্‌-হিন্দ্‌-ফৌজ গঠন, আজাদ্‌-হিন্দ্ সরকার স্থাপন
১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত ব্যবচ্ছেদ—বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ : দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ, ভারতের স্বাধীনতা লাভ
১৯৭০-৭১ খ্রীঃ পূর্ব-বাংলার 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণতি

পরিশিষ্ট

অনুশীলনী

পরিচ্ছেদ—১

(ক) ১। প্রাচীন কালে বাংলার সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার মোটামুটি ধারণা দাও।

২। কোন্ কোন্ অংশ লইয়া প্রাচীন কালের বাংলাদেশ গঠিত ছিল ?

৩। প্রাচীন গ্রন্থগুলির কোন্ কোন্‌টিতে বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায় ?

৪। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির আধুনিক নাম কি ?
পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, রাঢ়, বারেন্দ্রী।

৫। আর্যদের নিকট বাঙালীরা কি নামে পরিচিত ছিলেন ?

(খ) ১। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক সম্পর্কে কি জান লিখ।

২। হর্ষবর্ধন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবী গৌড়শূন্য করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা তিনি পূরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি ? এ-বিষয়ে বুঝাইয়া লিখ।

৩। হর্ষের সহিত শশাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?

৪। বাঙালীর ইতিহাসে শশাঙ্ক এক শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন— কেন বুঝাইয়া বল।

৫। শশাঙ্কের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর।

(গ) ১। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ? এই পরিস্থিতিতে বাঙালী জাতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল ?

২। মাৎস্য-ন্যায় বলিতে কি বুঝ ? শশাঙ্কের পরবর্তী কালের বাংলাদেশের পরিস্থিতির সহিত মাৎস্য-ন্যায়ের কিভাবে তুলনা করা চলে ?

৩। ধর্মপালের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৪। দেবপালকে পাল বংশের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা বলিবার যুক্তি কি ?

৫। দেবপালের সুখ্যাতি ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ? সুমাত্রার সহিত তাঁহার যোগাযোগ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৬। পালযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কি জান ?

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপর টীকা লিখ :
অতীশ-দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, আচার্য ধর্মপাল।

৯। টীকা লিখ :
চর্যাপদ, সৌরসেণী অপভ্রংশ, নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা।

(ঘ) ১। পাল বংশের পতনোন্মুখতার কারণ কি ?

২। কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। রামপালের আমলে পালশক্তির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস লিখ।

৪। পুনরুজ্জীবিত পাল রাজত্বকালের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। টীকা লিখ : সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণি দত্ত।

(ঙ) ১। সেন বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা কে ছিলেন ? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। বিজয়সেনের রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৩। কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন ? ইহার অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৪। লক্ষ্মণসেনের চরিত্র বর্ণনা কর।

৫। সেন আমলের সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৬। সেন যুগের সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

পরিচ্ছেদ—২

(ক) ১। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়া জয় করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা কর।

২। ১৮ জন মুসলমান অশ্বারোহী বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল ইহার সত্যতা বিচার কর।

৩। গিয়াস-উদ্দিন আজমের চরিত্র ও রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৪। রাজা গণেশ কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে সমস্ত বাংলাদেশের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ?

৫। যদু বা জালাল-উদ্দিনের শাসনকালের ইতিহাস লিখ।

৬। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহ্ ছিলেন শ্রেষ্ঠ—একথা কেন বলিব ?

৭। হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। হুসরৎ শাহের সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে কি জান লিখ।

৯। ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশের রাজত্বকালে সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারের ফলে সমসাময়িক হিন্দু সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল ?

১১। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যে-সকল বাঙালী জমিদার নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে-কোন দুইজন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। টীকা লিখ :

ঈশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য।

পরিচ্ছেদ—৩

১। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। মুর্শিদ্‌কুলির রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। আলিবর্দী খাঁর কর্মজীবন আলোচনা কর।

৪। সিরাজ-উদ্‌-দৌলার সহিত ইংরেজদের বিবাদের ইতিহাস বর্ণনা কর। ইহার পরিণতি কি হইয়াছিল ?

৫। কি কি ঘটনাচক্রে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

৬। রবার্ট ক্লাইভ কিভাবে বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা কর।

৭। মিরকাশিমের চরিত্র এবং দেশরক্ষার জন্য তাঁহার চেষ্টার আলোচনা কর।

৮। বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

৯। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ কর্তৃক দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর কি সুবিধা হইয়াছিল ?

১০। ছিয়াত্তরের (১১৭৬) মন্বন্তর সম্পর্কে টীকা লিখ।

১১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন ? ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

পরিচ্ছেদ—৪

১। বাংলার নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার নবজাগরণে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন ?

৩। সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী এবং দৃষ্টান্ত কিভাবে হিন্দু সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল ?

৫। বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান কি ছিল সে-বিষয়ে আলোচনা কর।

৬। টীকা লিখ :

(ক) রাজনারায়ণ বসু, (খ) কেশবচন্দ্র সেন।

পরিচ্ছেদ—৫

১। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? কে এই বঙ্গভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন ?

২। বাংলাদেশকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কিভাবে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছিল ? বাঙালী সমাজ ইহার বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল ?

৩। স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন ?

৫। শ্রীঅরবিন্দের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বাদেশিকতার ভাবধারা প্রসারে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন ?

৭। বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল কি ?

৮। টীকা লিখ :

(১) আনন্দমোহন বসু, (২) অরবিন্দ ঘোষ, (৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

পরিচ্ছেদ—৬

১। বাংলার বিপ্লবীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল ?

২। বাংলার বিপ্লবিগণ তাঁহাদের জীবন দান করিয়া কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ?

৩। রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন ও ক্ষুদিরামের জীবনবৃত্তান্ত লিখ।

৪। টীকা লিখ :

(ক) বিনয়-বাদল-দীনেশ
(খ) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
(গ) এম. এন. রায়
(ঘ) সূর্য সেন
(ঙ) মাতঙ্গিনী হাজরা।

৫। আই. এন. এ. বা আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজ ও নেতাজী সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

পরিচ্ছেদ—৭

১। বাংলার নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান আলোচনা কর।

২। ভগিনী নিবেদিতা বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য কি করিয়াছিলেন?

৩। বাঙালীদের আত্মনির্ভরশীলতা, দেশাত্মবোধ ও সমাজ চেতনা জাগাইয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কাজী নজরুল প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন?

৪। সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক আদর্শ ও তাঁহার অবদান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৫। বাংলা শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের অবদান আলোচনা কর।

৬। বিধানচন্দ্র রায় বাঙালীদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন?

৭। টীকা লিখ :

(ক) এ. কে. ফজলুল হক্
(খ) জগদীশচন্দ্র বসু।

পরিচ্ছেদ—৮

১। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত কেন করা হইয়াছিল?

২। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কোন্ অংশে কোন্ কোন্ অঞ্চল সংযুক্ত করা হইয়াছিল?

পরিচ্ছেদ—৯

১। শেখ মুজিবর রহমানের জীবনী ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা কর।

২। শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ নামে রাজনৈতিক দল স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

৩। পূর্ব-পাকিস্তান কিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল? এই ব্যাপারে ভারত সরকার ও ভারতবাসী কিরূপ সাহায্য দিয়াছিল?

লক্ষ্যমূলক বা Objective Type প্রশ্ন :

১। শূন্য স্থান পূরণ কর :

(ক) আর্যদের নিকট প্রাচীন কালের বাঙালীরা—নামে পরিচিত ছিল।

(খ) পুণ্ড্র ও রাঢ়-এর বর্তমান নাম হইল — ও —।

(গ) বেদের — প্রাচীন বাংলার উল্লেখ আছে।

২। সর্বপ্রথম বাঙালী সাম্রাজ্য স্থাপন কে করিয়াছিলেন ?

√ দাগ কাটিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাও।

বল্লালসেন ▭
হর্ষবর্ধন ▭
শশাঙ্ক ▭
হেমন্তসেন ▭

৩। কোন্ রাজা নির্দিষ্ট দিনে গৌড় শূন্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ?

√ দাগ কাটিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাও।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ▭
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ▭
প্রভাকরবর্ধন ▭
ভাস্করবর্মন ▭
হর্ষবর্ধন ▭

৪। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল উহাকে কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে ? এক কথায় উত্তর দাও।

৫। কোন্ দেশের রাজা দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন ?

√ দাগ দিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাও।

বর্ণিও ▭
যবদ্বীপ ▭
সুমাত্রা ▭
কম্বোজ ▭
চম্পা ▭

৬। কোন্ বাঙালী বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন ?

শীলভদ্র ☐
ধর্মপাল ☐
অতীশ দীপঙ্কর ☐
ধর্মরক্ষিত ☐

৭। সঠিক উত্তর কোন্‌টি ?

(i) নালন্দা

একটি বৌদ্ধমন্দির ☐
একটি বৌদ্ধস্তূপ ☐
একটি বিশ্ববিদ্যালয় ☐
একটি হিন্দু ধর্মমন্দির ☐

(ii) ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা

মৌর্য শাসনকালে স্থাপিত ☐
কুষাণ আমলে " ☐
পাল যুগে " ☐
সেন রাজত্বকালে " ☐

(iii) কৌলিন্য প্রথা কে চালু করিয়াছিলেন ?

রামপাল ☐
হেমন্তসেন ☐
লক্ষ্মণসেন ☐
বল্লালসেন ☐
সামন্তসেন ☐

(iv) লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়া কে জয় করিয়াছিলেন ?

আলা-উদ্দিন খল্‌জী ☐
ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জী ☐
বখ্‌তিয়ার খল্‌জী ☐
জালাল উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী ☐
শিহাব-উদ্দিন খল্‌জী ☐

(v) কোন্ নবাবের আমলে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ঘটিয়াছিল ?

- সর্‌ফরাজ খাঁ ☐
- আলিবর্দী খাঁ ☐
- সিরাজ-উদ্-দৌলা ☐
- মিরজাফর ☐
- মিরকাশিম ☐

(vi) বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে অবদান আছে এরূপ পাঁচজনের নামের পাশে ✓ দাগ দাও।

১। রামমোহন রায়
২। অবন্তীকিশোর দাশ
৩। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। ঈশ্বর গুপ্ত
৫। বিবেকানন্দ
৬। অভেদানন্দ
৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮। বাঘা যতীন
৯। মাতঙ্গিনী হাজরা
১০। অরবিন্দ ঘোষ

এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন তৈয়ার করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক/শিক্ষিকা আরও সুন্দরভাবে ইহা করিতে পারিবেন এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।